আমাদের পরিবেশ

চতুর্থ শ্রেণি

এখনো অঙ্কুর যাহা
তারি পথপানে
প্রত্যহ প্রভাতে রবি
আশীর্বাদ আনে।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

বিদ্যালয় শিক্ষা-দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, notes, meanings, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৩
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০১৭

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী চতুর্থ শ্রেণির '*আমাদের পরিবেশ*' বইটি প্রকাশিত হলো। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' তৈরি করেন। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী 'আমাদের পরিবেশ' বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলি তৈরি করার ক্ষেত্রে '*জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫*' এবং '*শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯*'- এই দুটি নথিকে বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আর অন্বেষণ প্রক্রিয়াকে হাতেকলমে ব্যবহার করার যথেষ্ট পরিসর বইটির মধ্যে রয়েছে। শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়ে কয়েকটি ভাবমূল (Theme)-কে ভিত্তি করে একদিকে যেমন বইটি রচিত, অন্যদিকে শ্রেণিকক্ষের চারদেয়ালের বাইরে যে বিশ্বপ্রকৃতির অবাধ ক্ষেত্র সেদিকেও শিক্ষার্থীর জানা-বোঝাকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস বইটিতে স্পষ্ট। আশা করা যায় বুনিয়াদি স্তরে শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান, সমাজ, ইতিহাস ও ভূগোল শিখনে চতুর্থ শ্রেণির '*আমাদের পরিবেশ*' বইটি যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

একদল নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ বইটি প্রণয়ন করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ বিভিন্ন শ্রেণির বইগুলিকে রঙে-ছবিতে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

'*আমাদের পরিবেশ*' বইটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হবে। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি কোণে বইটি যাতে যথাসময়ে পৌঁছে যায়, সেই ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার গ্রহণ করবে। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের মতামত আর পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

মার্চ, ২০১৭
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই *জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫* (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি আমাদের সমগ্র পরিকল্পনায় আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি।

লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, '... শিখিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময় প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্ত বায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।' ('শিক্ষাসমস্যা') '*আমাদের পরিবেশ*' পর্যায়ের বইগুলিতে আমরা উদার প্রকৃতির সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের সংযোগ তৈরি করার চেষ্টা করেছি। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রকৃতির সামনে নিয়মিত দাঁড়ায়, আমরা পাঠ্যপুস্তকে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছি। চতুর্থ শ্রেণি-র '*আমাদের পরিবেশ*' বইটিতে একটি নির্দিষ্ট বিন্যাস রয়েছে। প্রকৃতি এবং মানবজীবনের বিভিন্ন সম্পর্ক এই বইয়ের মধ্যে বিধৃত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে '*আমাদের পরিবেশ*' পর্যায়ের বইগুলিতে আমরা পরিবেশ পরিচয়ের সূত্রে বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ইতিহাসের প্রাথমিক ধারণাগুলিকে সন্নিবিষ্ট করেছি।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন,পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

মার্চ, ২০১৭

নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

পুস্তক নির্মাণ ও বিন্যাস

অধ্যাপক অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অধ্যাপিকা রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

পার্থপ্রতিম রায়	ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী	বিশ্বজিৎ বিশ্বাস	ডঃ ধীমান বসু
সুদীপ্ত চৌধুরী	ডঃ সন্দীপ রায়	দেবাশিস মণ্ডল	রুদ্রনীল ঘোষ
দেবব্রত মজুমদার	নীলাঞ্জন দাস	অনির্বাণ মণ্ডল	প্রদীপ কুমার বসাক

রুবি সরকার

পরামর্শ ও সহায়তা

শিরীণ মাসুদ	ডঃ শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য	ডাঃ সুব্রত গোস্বামী
কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য	রাজীব রায়	কৌশিক সাহা
	তন্ময় মৃধা	

পুস্তকসজ্জা

প্রচ্ছদ : সম্প্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

অলংকরণ : সম্প্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ও হিরাব্রত ঘোষ

সহায়তা : বিপ্লব মণ্ডল, দীপ্তেন্দু বিশ্বাস, অনুপম দত্ত, পিনাকী দে

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিবেশের উপাদান : জীবজগৎ	১-৪৫
পরিবেশের উপাদান : জড়বস্তুর জগৎ	৪৬-৭১
শরীর	৭২-১২৬
আবহাওয়া ও বাসস্থান	১২৭-১৮০
আমাদের আকাশ	১৮১-২০৯
প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা	২১০-২৬৮
জীবিকা ও সম্পদ	২৬৯-৩১৫

মানুষের পরিবার ও সমাজ	৩১৬-৩৭৯
আধুনিক সভ্যতা ও পরিবেশের সংরক্ষণ	৩৮০-৪০৯
স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সংগ্রহশালা	৪১০-৪৩৮
রংবাহার	৪৩৯-৪৪২
আমার পাতা	৪৪৩-৪৪৪
পাঠ্যসূচি	৪৪৫-৪৪৮
শিখনপরামর্শ	৪৪৯-৪৫২

এই পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে কয়েকটি কথা

আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর রোগনির্ণয় ও তার চিকিৎসা বিষয়ে ১৮৯২ সালে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন :

'মাল-মশলা যাহা জড়ো হইতেছে তাহা প্রচুর তাহার আর সন্দেহ নাই; মানসিক অট্টালিকা নির্মাণের উপযুক্ত এত ইট- পাটকেল পূর্বে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখলেই যে নির্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া নেওয়া হয়, সেইটেই একটা মস্ত ভুল। সংগ্রহ এবং নির্মাণ যখন একই সঙ্গে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকে তখনই কাজটা পাকা রকমের হয়।'

আমরা রবীন্দ্রনাথের রোগনির্ণয় ও চিকিৎসাবিধান মেনে চেষ্টা করেছি এই পাঠ্যপুস্তক তৈরি করার। যার সাহায্যে আমাদের পড়ুয়াদের জ্ঞানগঠন সহজে হতে পারে। বিগত এক বছর ধরে শিক্ষক-শিক্ষিকা অভিভাবক-অভিভাবিকা ও সমাজের বহু মানুষের সুচিন্তিত গঠনমূলক উপদেশ এই পাঠ্যপুস্তক নির্মাণের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা বাড়িয়েছে। আমাদের আশা এই বই পড়ার সময় শিশু পাঠ্যবিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাতে সে আনন্দ পাবে।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫-এ বলা হয়েছে 'Appreciation of beauty and art forms is an integral part of human life. Creativity in arts, literature and other domain of knowledge is closely linked. Education must provide the means and opportunities to enhance the child creative expression and the capacity for aesthetic appreciation'। পাঠ্যপুস্তক নির্মাণকালে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ -এর উদ্দেশ্যগুলিকে যথাযথ মান্যতা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকা ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় ও গঠনমূলক অংশ গ্রহণ, সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া এই সাফল্য অর্জন কোনোদিনই সম্ভব হবে না। তাই মুখ্যত তাঁদের উদ্দেশ্যেই এইসব কথা। যেহেতু চলার পথটি কিছুটা হলেও নতুন, তাই এই বই-এর শেষে কিছু শিখন পরামর্শ দেওয়া হলো। কিন্তু তা অসম্পূর্ণ। পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে আপনাদের ভাবনায়। জানাবেন আপনাদের পরামর্শ।

এই বই পাঠে শিশুর জ্ঞান গঠন প্রক্রিয়া যদি এগিয়ে যায় 'আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ' করতে থাকে তবেই বইটি সার্থকতা অর্জন করবে।

শিশুরা শ্রেণিকক্ষে কী করবে, শিক্ষিকা ও শিক্ষকরা কীভাবে তাদের সাহায্যকারী (facilitator) হয়ে উঠবেন তার উদাহরণ বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় রয়েছে। বাড়ির লোক ও পাড়ার লোকদের কাছে কী সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে তার উদাহরণও রয়েছে বইয়ের অনেক পৃষ্ঠায়।

আসুন, সবাই মিলে আমরা শিশুদের শৈশব কেড়ে না নিয়ে তাকে এমন বইয়ের সঙ্গে পরিচিত করাব যা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শিক্ষাপুস্তক' নয়, 'পাঠ্যপুস্তক'।

আমাদের পরিবেশ

আমার নাম .....

আমার মায়ের নাম .....

আমার বাবার নাম .....

আমার রোল নম্বর .....

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম .....

আমাদের বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম .....

.....

আমাদের গ্রামের নাম/শহরের নাম.....

.....

আমাদের জেলার নাম .....

চারপাশের নানা জীব

রেহানা, রিহান, টিপাই, টিকলু ও ইতুরা সবাই মিলে ওদের চারপাশের নানা বন্ধুদের কথা বলছিল।

ইতু বলল --- মাছেদের কালকে পিঁপড়ের ডিম খাইয়েছি।

রেহানা বলল— কোথা থেকে পেলি?

— বাড়ির পিছন দিকে ঘুরছিলাম। এমন সময় শ্যাওলাধরা একটা ইটে হোঁচট খেলাম। ইটটা গেল উলটে। ওরে বাবা কত পিঁপড়ে। প্রচুর ডিম। দৌড়ে একটা চামচ নিয়ে এসে প্যাকেটে ভরলাম। তারপর মাছেদের খাওয়ালাম। কী মজা করে ওরা খেলে।

এমন সময় দিদিমণি এলেন। ইতুদের বললেন—কী আলোচনা হচ্ছে? টিকলু বলল ওদের আলোচনার কথা।

দিদি বললেন — ইতু, ইটটা কতদিনের পুরোনো?

ইতু বলল — তা অনেক দিনের হবে।

তাহলে দেখো ইটের তলায় পিঁপড়েরা নিজেদের সংখ্যা কত বাড়িয়ে ফেলেছে। ইটের সংখ্যা কিন্তু একই আছে। কেন বলোতো?

রেহানা, রিহানরা সবাই একসঙ্গে বলল— দিদি, ইট থেকে তো ইট হয় না।

দিদি বললেন— ঠিক বলেছ, আসলে ইট হলো জড় পদার্থ।

টিকলু বলল-— দিদি, আমাদের পুকুরে কত ব্যাঙাচি হয়েছিল। পরশু দিন বৃষ্টি হলো। আর আমাদের বাড়ির উঠোন জুড়ে কত ছোটো ছোটো ব্যাং। খুব মজা লাগছিল। সবাই মিলে কেমন লাফালাফি করছিল।

দিদি বললেন — বাঃ, বেশ খেয়াল করেছ তো। ঠিক আছে, এবার তোমরা তোমাদের ঘিরে থাকা নানা জীব ও জড় পদার্থের তালিকা করে ফেলো।

তোমাকে ঘিরে থাকা জীবের তালিকা	তোমাকে ঘিরে থাকা জড় পদার্থের তালিকা
১। কুকুর	১। খাট
২। বটগাছ	২। বালি
৩।	৩।
৪।	৪।
৫।	৫।
৬।	৬।

জীবের এত কাজ

দিদিমণি ক্লাসে প্রাণীদের নানা কাজ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সাইনা বলল — দিদি আমাদের তো দুটো হাত আর দুটো পা। তা দিয়ে আমরা কত কাজ করি।

মিন্টু বলল— আমি তো কাঠবেড়ালিকে হাতে ধরে পেয়ারা খেতে দেখেছি। আবার চারপায়ে দৌড়োতেও দেখেছি।

ইতু বলল— পিঁপড়েরা কতদূর থেকে খাবার বয়ে নিয়ে যায়। পায়রা, চড়াই গাছের ডাল ঠোঁটে করে নিয়ে যায় বাসা বাঁধার জন্য।

সুমিতা বলল— কালকে আমাদের বাড়ির বিড়াল ঠিক গন্ধ শুঁকে রান্নাঘর থেকে মাছ খেয়ে গেছে।

দিদিমণি বললেন— তোমরা তো নানা প্রাণীর কাজ বেশ লক্ষ করেছ।

নীচের তালিকায় নানাধরনের জীবের নানারকম কাজের কথা লেখা আছে। তোমরা দলে আলোচনা করে তোমার পরিচিত কোন কোন জীবকে ওই কাজ করতে দেখেছ তা লেখো।

জীবের নানারকম কাজের তালিকা	জীবের নাম
১। খাবার জোগাড় করা	
২। জায়গা পরিবর্তন করা	
৩। ডিম পাড়া	
৪। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনো	
৫। শ্বাস নেওয়া ও ছাড়া	
৬।	
৭।	
৮।	

একইরকম জীব যারা

হীরামতিদের বাগানে কত পাখি আসে। ওর ঘুম থেকে ওঠার আগেই পাখিদের কিচিরমিচির শুরু হয়ে যায়। পায়রা, চড়াই, ময়না, টুনটুনি, শালিক আরো কত রকমের নাম-না-জানা পাখি। ঘুম থেকে উঠে হীরামতি পাখিদের মুড়ি খেতে দেয়। সুমিদের পুকুরে আবার নানারকমের মাছ। পুঁটি, তেলাপিয়া, রুই, কাতলা। সুমি প্রতিদিন ওদের কুঁড়ো খেতে দেয়। তাপস প্রতিদিন সকালে গোরুদের মাঠে বেঁধে দিয়ে আসে। বাবলুদের বাগানে নানারকম গাছ। আম, কাঁঠাল, কুমড়ো, মেহগিনি, কলকে, গাঁদা, জবা, নিম আরও কত কী। নরেশদের পাহাড়ে অবশ্য ঝাউ, পাইন গাছই বেশি দেখা যায়।

(ক) নীচে বিভিন্ন ধরনের জীবের নাম লেখা আছে। তোমরা দলে আলোচনা করে ওদের নীচের ছকে সাজানোর চেষ্টা করো।

১) থানকুনি ২) ব্যাং ৩) সজনে ৪) গরান ৫) বাঘ ৬) শকুন ৭) শিমুল ৮) ব্যাঙের ছাতা ৯) মশা ১০) গন্ডার১১) হরিণ ১২) হাতি ১৩) শ্যাওলা ১৪) গোরু ১৫) ভালুক ১৬) পেয়ারা ১৭) পাইন ১৮) ফার্ন ১৯) মানুষ ২০) শাল

উদ্ভিদ	প্রাণী

(খ) নীচের প্রাণীরা বিভিন্ন ধরনের খাবার খায়। সবার খাবার এক নয়। যে যা খায়, তার ভিত্তিতে তাদের আলাদা দলে ভাগ করো :

১) হরিণ ২) বাঘ ৩) কাক ৪) শকুন ৫) গোরু ৬) ভালুক ৭) চড়ুই ৮) মশা ৯) প্রজাপতি ১০) হাতি ১১) সিংহ ১২) রুই ১৩) কুকুর ১৪) বিড়াল ১৫) শালিক ১৬) ভেড়া ১৭) কেঁচো ১৮) ব্যাং ১৯) টিকটিকি ২০) আরশোলা ২১) ইঁদুর

প্রাণীদের নাম	কী খায়

আমরা সবাই মিলে বাঁচব

টিপাইয়ের দাদু রোজ বিকেলে মাঠের ধারে এসে বসেন। খেলা শেষে পিকলু, টিপাইরা দাদুর কাছে নানা কথা শোনে।

পিকলু বলল--- আমাদের চারপাশে কতরকমের প্রাণী। কতরকমের গাছ। প্রত্যেকেই তো কিছু না কিছু খেয়ে বেঁচে রয়েছে। যদি একদিন সব খাবার শেষ হয়ে যায় তাহলে কী হবে?

দাদু মুচকি হেসে বললেন— তা সহজে হওয়ার নয়। যদি না আমরা সব শেষ করে দিই।

টিপাই বলল— আমরা কী করে শেষ করব?

রীতা বলল— কেন, সাপ তো ইঁদুর খায়। আমরা যদি সব সাপ মেরে ফেলি তবে ইঁদুর এত বেড়ে যাবে যে আমাদের হবে বিপদ।

দাদু বললেন — কয়েক বছর আগেও বর্ষাকালে একটু বৃষ্টি হলেই কত ব্যাং ডাকত। এখন ওদের সংখ্যা কমে গেছে।

আমিনা বলল— কেন, ওরাও কি খাবার পায় না?

— হ্যাঁ, দিদিভাই ঠিক বলেছ। ব্যাঙেদের খাবার হলো পোকামাকড়। জমিতে পোকা মারার জন্য আমরা বিষ দিই। এতেও ব্যাংরা মরে যেতে পারে।

ডমরু বলল — আমরাও তো অন্য জীবদের ওপর নির্ভর করে থাকি।

টিপাই বলল— হরিণ ঘাস খায়। হরিণকে খায় বাঘ।

নয়ন বলল— চিড়িয়াখানায় জিরাফকে উঁচু গাছের পাতা খেতে দেখেছি। হারুদের ছাগল আবার ছোটো গাছের পাতা খায়।

দাদু বললেন— আমরা সবাই সবার ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছি। এভাবেই আমাদের পরিবেশ টিকে থাকে।

তোমরা দলে আলোচনা করে নীচের ফাঁকা খোপগুলো ভরাট করো। তির চিহ্ন হচ্ছে কে কাকে খায় তার নির্দেশ। দেখো তো তোমার পরিচিত জীবের দল বেঁচে থাকার জন্য কোন কোন প্রাণীর ওপর নির্ভর করে থাকে।

১। ঘাস → ঘাস ফড়িং → ☐ → সাপ

২। জলের শ্যাওলা → ☐ → মাছরাঙা

৩। ঘাসপাতা → খরগোশ → ☐

৪। গাছের মূল → ☐ → ☐

গাছের পাতা → ☐ → ☐

গাছের পাতা → ☐ → ☐ → ☐

গাছের কাণ্ড → ☐

↓

গাছের ফল → ☐ → ☐

জলের উদ্ভিদ আর ডাঙার উদ্ভিদ

গাছ আর গাছের ফুলগুলো দেখো। তারপর কোনটা কোন গাছ আর কোনটা কোন গাছের ফুল তা খাতায় লিখে ফেলো।

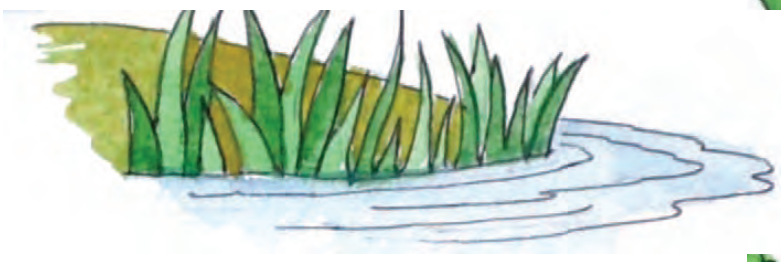

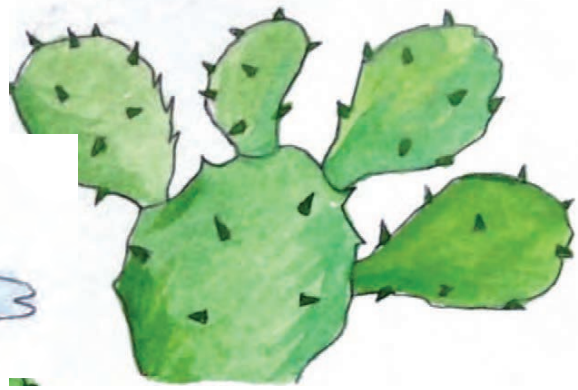

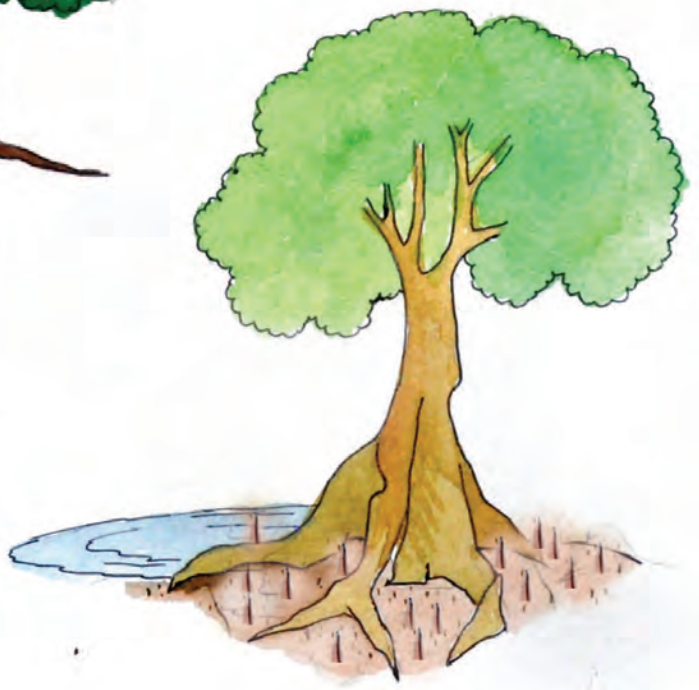

আগের পাতার ছবি দেখো। শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে উদ্ভিদগুলোকে চেনার চেষ্টা করো। তারপর নীচে লেখো।

১।স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় জন্মানো গাছ	
২। জলের নীচে জন্মানো গাছ	
৩। জলে ভাসমান গাছ	
৪। শুকনো মাটিতে জন্মানো গাছ	
৫। পাহাড়ি জায়গার গাছ	
৬। বালিতে জন্মানো গাছ	
৭। নোনাজলের পাশে জন্মানো গাছ	

তিতলিদের পুকুরে আজ পানা পরিষ্কার করা হবে। রহমানচাচা, বিশুকাকুরা খড় বেঁধে বিরাট দড়ি তৈরি করেছেন। পুরো পুকুরজুড়ে বিছিয়ে দিয়েছেন। তারপর দু-দিক দিয়ে ধীরে ধীরে টান দিলেন। সব পানাগুলো পুকুরপাড়ে জড়ো হয়ে গেল। ফিরোজ, শম্পা, বিল্টুরা এসব দেখছিল।

বিল্টু বলল — জলেতে কতরকম গাছ।

ফিরোজ বলল — ডাঙাতেও তো কতরকম গাছ। বাড়ির ফণীমনসার গায়ে কত কাঁটা। কোনোদিনও জল দিতে হয় না। জিওল গাছে আঠা। শিমুল গাছে তুলো। পলাশ গাছে আগুন-রঙা ফুল। গরানের কাঠ।

তিতলি বলল --- গত বছর দার্জিলিং গিয়েছিলাম। সেখানে বড়ো বড়ো পাইনগাছ দেখেছিলাম।

ফিরোজ বলল — চলো একটা কাজ করি। আমাদের এলাকায় জলে আর ডাঙায় নানারকম গাছ আছে। তার তালিকা করে দিদিমণিকে দেখাই।

তোমরা এবার তোমাদের এলাকায় কী কী উদ্ভিদ পাওয়া যায় তা চেনো। উদ্ভিদের ধরন অনুযায়ী তাদের নীচের তালিকায় লেখো।

১। জলের গাছ	
২। ডাঙার গাছ	
৩। কাঁটা আছে এমন গাছ	
৪। ফুল ও ফল হয় এমন গাছ	
৫। ফুল ও ফল হয় না এমন গাছ	
৬। বিষাক্ত গাছ	
৭। কাঠ পাওয়া যায় এমন গাছ	
৮। লতানো গাছ	

নানা ধরনের প্রাণী

নীচের প্রাণীগুলোকে দেখো। তারপর খাতায় তাদের নাম লেখো।

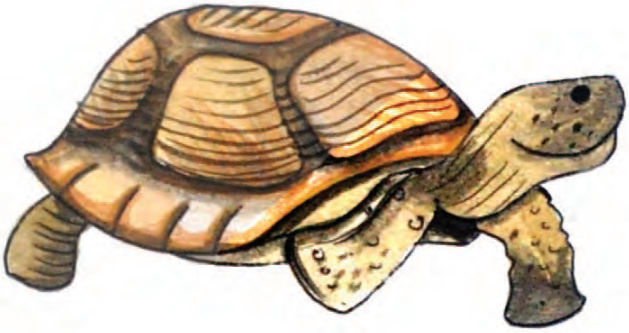

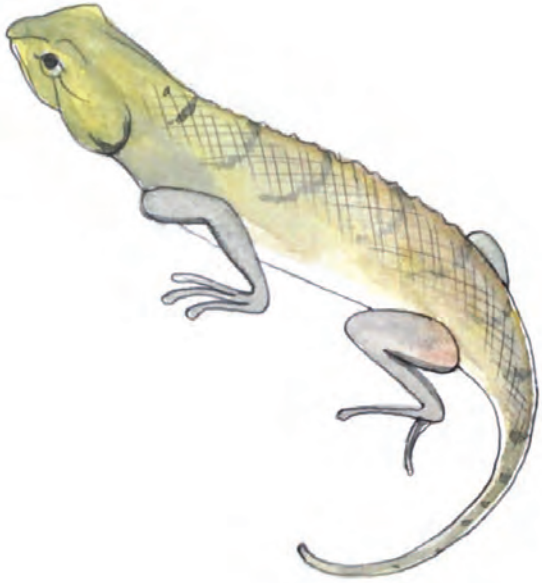

পরিবেশের উপাদান : জীবজগৎ

—আমাদের চারপাশে কতরকম প্রাণী রয়েছে বলোতো। কেউ উড়ে বেড়ায়। কেউ সাঁতার কাটে। কেউ চারপায়ে হাঁটে। কেউ দু-পায়ে। কারোর আবার অনেক পা। কেউ আবার বুকে হেঁটে চলে। কেউ পাতায় থাকে। কেউ থাকে জলে। কেউ আবার মাটির তলায় বেশ আনন্দে থাকে। সব প্রাণীরই বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। এদের নানারকম রং। এরা প্রত্যেকেই নিজের জায়গায় সুন্দর। এরা নিজের মতো থাকার জায়গা খুঁজে নেয়। খাবার জোগাড় করে। নতুন নতুন প্রাণীর জন্ম দেয়। আবার বেশ কিছু প্রাণী আছে যাদের খালি চোখে দেখাই যায় না। এইভাবেই পরিবেশে আমরা সবাই মিলে বেঁচে থাকি।

হ্যাঁ আছে। ওদের দেখতে গেলে এই যন্ত্রের দরকার। এতে চোখ রাখলেই ওদের নড়াচড়া দেখতে পাবে। এই যন্ত্রের নাম মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

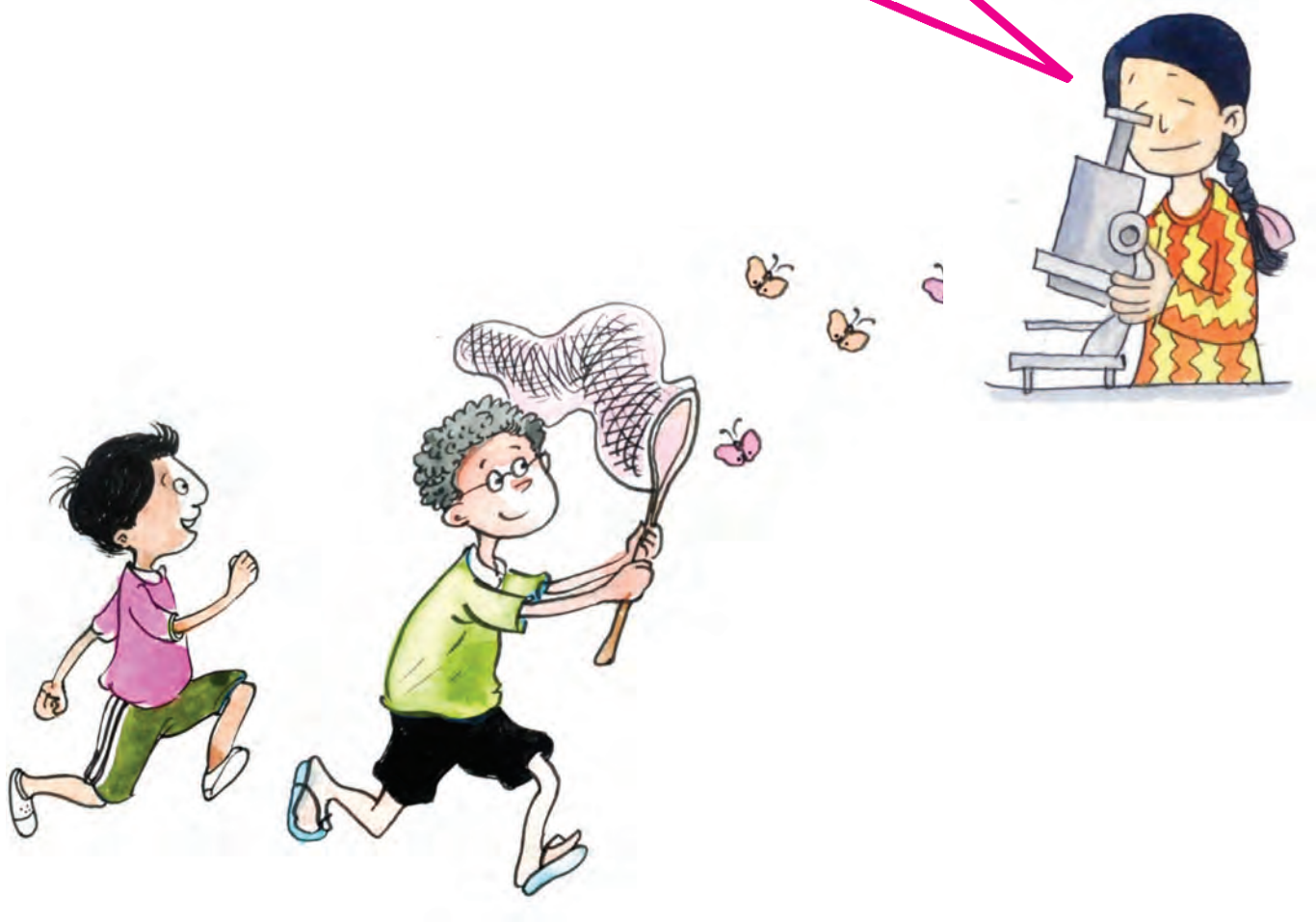

আগের পাতায় কিছু প্রাণীর ছবি দেওয়া আছে। তাদের দেখো। তারপর দলে মিলে নীচের তালিকাটি পূরণ করো। তারপর তোমরা চারপাশে থাকা নানা প্রাণীর নাম নীচের ছকে লেখো।

জলে থাকে	দেয়ালে থাকে	জলে ও ডাঙায় দুই জায়গাতেই থাকে	গাছে থাকে	বনে থাকে	ফুলে ফুলে ঘোরে	পাতায় থাকে	জলে থাকে, কিন্তু খালি চোখে দেখা যায় না

টিকলু দৌড়ে স্কুলের দিকে যাচ্ছিল। পায়ের কাছে হঠাৎ একটা কেন্নো এসে গেল। কোনোরকমে থামল টিকলু। কিন্তু একটু ছোঁয়া লাগল। অমনি কেন্নোটা গোল হয়ে গুটিয়ে গেল। আর নড়েও না চড়েও না। খানিকক্ষণ লক্ষ করল টিকলু। তারপর দেখে কেন্নো আস্তে আস্তে তার গুটি খুলে ফেলছে। টিকলু স্কুলে গিয়ে দিদিকে বলল—দিদি, কেন্নোকে ছুঁলেই গোল হয়ে যায়। তবে টিকটিকিকে ছুঁলে তো গোল হয় না।

দিদি বললেন— আমরাও অমন গোল হতে পারব না।

টিপাই বলল— আমাদের তো শিরদাঁড়া আছে। আমরা পারব কী করে?

বাবলু বলল— আরশোলা, পোকামাকড়, কেঁচো, কৃমি সবই কেন্নোর মতোই প্রাণী। শিরদাঁড়া নেই।

দিদি বললেন— ঠিক বলেছ। তবে শিরদাঁড়া থাকলেও অনেক প্রাণী গুটিয়ে থাকতে পারে।

টিকলু বলল— টিকটিকির মতো কারা?

ডমরু বলল— মাছ, ব্যাং, সাপ, পাখি আর আমরা।

তোমাদের এলাকায় বিভিন্ন প্রাণী দেখো। তারপর নীচের খোপগুলি ভরে ফেলো।

প্রাণীর নাম	কোথায় থাকে	গায়ের রং	আঁশ আছে কিনা	পায়ের সংখ্যা	ডানার সংখ্যা	লেজ আছে কিনা	কী খায়

পাশাপাশি দুটি প্রাণীর ছবি দেওয়া আছে। এদের একটা মিল ও একটা অমিল লেখো।

মিল	অমিল

মিল	অমিল

মিল	অমিল

মিল	অমিল

নানা প্রাণীর নানা রূপ

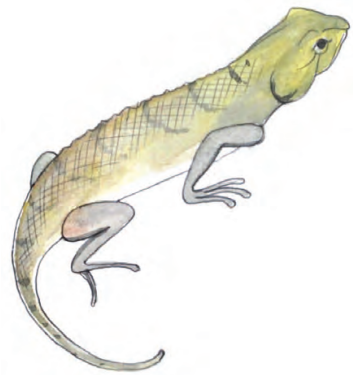

গিরগিটিটা পাঁচিলের ওপর বসে রোদ পোহাচ্ছিল। কিছু দিন আগে টিপাই এই গিরগিটিটাকে দেখেছিল জবা গাছের ডালে। কেমন ছাইরঙা। আজ কিন্তু ও ভালো করে দেখতে পায়নি। বেশ খয়েরি রঙা। পাঁচিলের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। পথে বুম্বার সঙ্গে দেখা। বুম্বাকে টিপাই গিরগিটির কথা বলল।

বুম্বা বলল— জানিস সেদিন আমাদের বাড়ির গাছে একটা সাপ দেখেছিলাম। পুরো সবুজ রঙের। আমি তো প্রথমে দেখতে পাইনি। হঠাৎ কী একটা নড়ছে দেখলাম। তারপর বুঝলাম ওটা সাপ।

পরদিন ক্লাসে দিদিমণিকে এসব কথা বলল।

দিদিমণি বললেন— বাঃ, তোমরা তো বিভিন্ন প্রাণীর গায়ের রং ভালো লক্ষ করেছ। অনেক প্রাণীরাই রং বদলে বা বিশেষ রং ধারণ করে বাঁচার চেষ্টা করে। যাতে অন্য প্রাণী বা মানুষ এসে মেরে না দেয়।

রীতা বলল— দিদি শজারুর গায়ে কাঁটা কেন?

বুম্বা বলল— যাতে ওদের কেউ ধরতে না পারে?

দিদিমণি বললেন— ঠিক বলেছ।

টিপাই বলল— তাহলে গোরুর শিং?

ডমরু বলে উঠল— কেউ মারতে গেলেই গুঁতিয়ে দেবে।

সবাই হেসে উঠল। দিদিমণি বললেন--- বাঘের ডোরাকাটা দাগ, হাতির শুঁড় ও দাঁত, ভালুকের থাবায় নখ সবই নিজেকে বাঁচানোর জন্য।

শজারুর কাঁটা

গোরুর শিং

হাতির শুঁড়

তোমরা এবার দলে মিলে নীচের কাজটা করে ফেলো। তোমাদের এলাকার প্রাণীগুলোকে দেখো। শিংওলা, নখওলা, চারপাশের গাছপালার সঙ্গে রং মিলিয়ে চলা প্রাণীদের নাম নীচের তালিকায় লেখো।

কী ধরনের প্রাণী	প্রাণীদের নাম
১ ।শিংওলা প্রাণী	
২ ।ধারালো নখওয়ালা প্রাণী	
৩ ।গাছপালার রঙের সঙ্গে রং মিলিয়ে চলা প্রাণী	

জলজ প্রাণীর কথা

রুই মাছ

শিঙি মাছ

চিংড়ি

কাঁকড়া

জলে থাকে মাছ। মাছেরাও নানারকমের। নানা নামও রয়েছে। কারোর নাম রুই, কাতলা। কারোর নাম কই,

শিঙি। কারোর নাম বোয়াল, তো কারোর নাম ন্যাদোস। সবাই জলে থাকে। জলে সবাই সাঁতরে চলে। তাই রয়েছে পাখনা। নানা ধরনের পাখনা। আর রয়েছে আঁশ। সারা শরীরজুড়ে। আঁশগুলো বেশ শক্তপোক্ত। বাইরের আঘাত থেকে বাঁচায়। শিঙি, মাগুরের কাঁটা বেশ সুঁচালো। শত্রুরা ভয় পেয়ে যায়। জলে শুধুই কী মাছ। জলে থাকে কাঁকড়া, চিংড়ি, শামুক, কচ্ছপ, কুমির কত কী। কাঁকড়ার দাঁড়াগুলো বেশ খাঁজকাটা। শামুকের মতো নরম শরীরটা শক্ত খোলসে ঢাকা, কচ্ছপেরও তাই। হাঁস কিন্তু পাখি। জল ছাড়া থাকতেই পারে না। সাঁতার কাটার জন্য পায়ের আঙুলগুলো জোড়া।

ব্যাং

শামুক

ঝিনুক

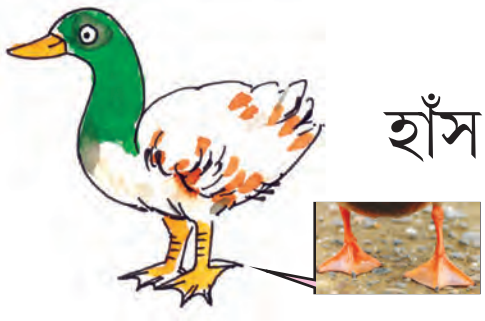

হাঁস

এবার তোমরা জলের প্রাণীগুলোকে দেখো। জলে থাকার জন্য তারা কোন কোন অঙ্গ কীভাবে ব্যবহার করে তা লেখো।

প্রাণীর নাম	অঙ্গের নাম	তাদের কাজ
১। চিংড়ি		
২। শামুক		
৩। কাঁকড়া		
৪। রুই মাছ		

পাখির মতো উড়ব

রন্তু রোজ সন্ধ্যাবেলা পাখিদের বাসায় ফেরা দেখে। ভীষণ ইচ্ছে ওর পাখির মতো ওড়ার। তাহলে যখন খুশি, যেখানে খুশি যাওয়া যাবে। ও হাত দুটোকে দু-পাশে বাড়ায়। পাখির মতো নাড়তে থাকে। কিন্তু উড়তেই পারে না। ওর তো আর পালক নেই। ডানাও নেই। আর শরীর বেশ ভারী।

উড়বে কী করে? ডালে বসে থাকার জন্য পাখিদের আঙুলের নখগুলো বেশ সুঁচালো। কিন্তু রন্তুর আঙুলের নখগুলো সুঁচালো নয়। রন্তু বেশি ছুটলে হাঁপিয়ে যায়। অথচ, পাখিরা তো অতক্ষণ আকাশে ওড়ে তাও ক্লান্ত হয় না। পাখিদের শরীরের ভেতরে বাতাস ভরা থলি আছে। তারা সেই থলিতে অনেকটা বাতাস একবারে ভরে নেয়। আর আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়।

চড়াই

ধনেশ

পেঁচা

টুনটুনি

কাঠঠোকর

শালিক

তোমরা ছবির পাখিগুলোকে দেখে নীচের কাজটি করে ফেলো।

পাখির নাম	ডানার রং	ঠোঁট লম্বা না ছোটো/সরু না মোটা	কী খায়
১। চড়াই			
২। ধনেশ			
৩। টুনটুনি			
৪। পেঁচা			
৫। শালিক			
৬। কাঠঠোকরা			

হারিয়ে যাচ্ছে বাঘ

সেদিন সকালে রেডিয়োতে খবর শুনেছে টুকুন — বাঘকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে আরও অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্কুলে এসে স্যারকে জিজ্ঞেস করল— বাঘ কেন বিলুপ্ত হবে?

স্যার বললেন — মানুষ জঙ্গল সব কেটে ফেলছে। বাঘের থাকার জায়গা কমে যাচ্ছে। জঙ্গলে হরিণ, শুয়োর এসব কমে যাচ্ছে। বাঘ খাবে কী? আবার চোরাশিকারিরা বাঘের চামড়া- নখ-হাড় এসবের লোভে বাঘ মেরে

ফেলছে। ফলে বাঘের সংখ্যা এত কমে যাচ্ছে যে সবাই মনে করছে, একটা বাঘও আর পৃথিবীতে থাকবে না। তখন বলা হবে যে বাঘ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেটা যাতে না হয় তার জন্য সরকারের বনবিভাগ এবং আরও অনেকে খুব চেষ্টা করছে।

সুমিরা জিজ্ঞাসা করল—বাঘ ছাড়া আর কোনো প্রাণী কি বিলুপ্ত হতে পারে?

— নিশ্চয়। গন্ডার, বুনো মোষ, নানা ধরনের বাঁদর, পাখি, সাপ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানীরা। তাই ওইসব প্রাণীদের সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

টুকুন বলল— সংরক্ষণ কী?

স্যার বললেন— যে যে কারণে জীবটার সংখ্যা কমে যায় সেইসব কারণগুলো যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা করা-তাকেই বলে সংরক্ষণ। যেমন– বনজঙ্গল না কাটা, সেখানে প্রাণীদের খাবার ও তেষ্টার জল যাতে যথেষ্ট

পরিমাণে থাকে তার ব্যবস্থা করা, চোরাশিকারিরা যেন তাদের মারতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখা।

রতন বলল— আমার দাদু যে বলেন, সোনা ব্যাং এত কমে গেছে এখন, বিলুপ্ত-ই হয়ে যাবে হয়তো। সোনা ব্যাঙেরও কি সংরক্ষণ দরকার?

স্যার বললেন— অবশ্যই। যে-কোনো প্রাণী এমনকি উদ্ভিদ যদি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে বলে মনে হয়, তবে তাদের টিকিয়ে রাখার জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

আনন্দ বলল—মশা, ইঁদুর এদেরও কি সংরক্ষণ করা দরকার?

স্যার মুচকি হেসে বললেন— কেন, তোমাদের এলাকায় কি ওরা খুব কমে গেছে? ওদের জন্য তোমার এত চিন্তা।

সবাই হেসে উঠল।

বন্যেরা বনেই সুন্দর তাই না? জঙ্গলে নানা গাছপালার সমাহার। তারই মধ্যে কতরকম জন্তু। সবাই মহানন্দে থাকে। কেউ গাছের ওপরে থাকে । কেউ বা নীচে। বড়ো বড়ো গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে শিকার করে। কেউ গাছের ফলমূল খায়। এভাবেই চলে তাদের জঙ্গলজীবন। এমন সময় যদি আমরা জঙ্গলের গাছপালা কাটি, নিজেদের বাড়ি বানাই, জঙ্গল সাফ করি— তাহলে ওরা থাকবে কোথায়? আমরা মাংসের জন্য যদি হরিণ,

বুনোশুয়োর শিকার করি, তাহলে ওদের খেয়ে যারা বেঁচে থাকে তারা যাবে কোথায়? আজকাল প্রায়ই শুনি সুন্দরবনের বাঘ লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে। তাই মাঝে মাঝেই বন দফতরের ডাক পড়ে। তারা এসে বাঘকে উদ্ধার করে। গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসে।

মরিশাসের ডোডো আজ আর নেই

মরিশাস, ভারত মহাসাগরের বুকে একটি ছোট্ট দ্বীপ। প্রায় পাঁচশো বছর আগের কথা। তখনও মানুষের এত বসবাস গড়ে ওঠেনি। সেখানে নানা পশু-পাখি মহানন্দে ছিল। তার মধ্যে হাঁসের মতো দেখতে একরকমের পাখি ছিল। নাম ছিল ডোডো। হঠাৎ বিদেশি জাহাজ এসে ভিড়ল। এল প্রচুর মানুষ। তার সঙ্গে এল প্রচুর বিড়াল, ইঁদুর, কুকুর, বানরের দল। শুরু হলো ডোডো মারার পালা। আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল তারা।

নীচের পশু-পাখিগুলিও হারিয়ে যাওয়ার পথে। তাদের বাঁচানো খুবই দরকার। তোমরা দলে মিলে আলোচনা করে তাদের হারিয়ে যাওয়ার কারণগুলি লেখো। তাদের বাঁচাবেই বা কী করে?

১। চড়ুই　　২। শকুন　　৩। গোসাপ

৪। ব্যাং　　৫। বাঘ

হারিয়ে গেছে যারা

বালিদ্বীপের বাঘ

হিমালয়ের বামন তিতির

গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের কচ্ছপ

ভারতের গোলাপি মাথা হাঁস

নিউজিল্যান্ডের গ্রেলিং মাছ

আমাদের চোখের সামনে কতরকম প্রাণী। এর বাইরেও রয়েছে আরও অনেক প্রাণী। অনেক প্রাণী আবার হারিয়েও গেছে। তাদের হারিয়ে যাওয়ার কারণও রয়েছে। যেসব প্রাণী হারিয়ে গেছে তারা হলো বিলুপ্ত প্রাণী। তাদের আর ফিরে পাওয়া যাবে না। সেসব আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। আমাদের চারপাশেও এমন বেশ কিছু প্রাণী রয়েছে যাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আমরা যদি সচেতন না হই তারাও হারিয়ে যাবে একদিন। তারা এখন ভীষণ বিপন্ন।

হারিয়ে যেতে চলেছে যারা

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

অলিভ রিডলে কচ্ছপ

একশৃঙ্গ গন্ডার

কৃষ্ণসার হরিণ

আমাদের চোখের সামনে কত গাছপালা, কত প্রাণী। একসময় আরও ছিল। হারিয়ে গেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। আবার কতই না নতুন নতুন প্রাণ জন্ম নিয়েছে। আমাদের চারপাশে তারা রয়েছে। তাদেরকে চেনা দরকার। না চিনলে আমরা তাদের বাঁচাব কী করে। আর তারা না বাঁচলে আমরাও থাকব না। তোমরা তো তোমাদের অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের চিনেছ। এবার চলো আরো কিছু বিশেষ উদ্ভিদ ও প্রাণীদেরকে চিনি, জানি। তবেই না আমরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের গাছপালা আর প্রাণীদের সম্বন্ধে জানব। তবে এব্যাপারে বাড়ির বড়োদের সাহায্য নিতে ভুলো না ।

এবার তোমরা তোমাদের এলাকায় যে যে উদ্ভিদ ও প্রাণীরা প্রচুর পরিমাণে আছে, নীচের তালিকায় তাদের নামের পাশে টিক দাও। তাছাড়াও আরও কিছু বিশেষ প্রাণী বা উদ্ভিদ তোমাদের এলাকায় থাকতে পারে। তাদের নামও লিখে ফেলো।

উদ্ভিদের নাম	টিক দাও	প্রাণীদের নাম	টিক দাও
১। বট		১। কেঁচো	
২। পাইন		২। কাঁকড়া	
৩। গরান		৩। ধনেশ পাখি	
৪। বনতুলসী		৪। বেঁজি	
৫। লিচু		৫। বাবুই	
৬। বাবলা		৬। ভাম	
৭। নয়নতারা		৭। মাছরাঙা	
৮। জিওল		৮। বাঘ	
৯। বাঁশ		৯। ডাকপাখি	
১০। ফণীমনসা		১০। গোসাপ	

উদ্ভিদের নাম	টিক দাও	প্রাণীদের নাম	টিক দাও
১১।অর্জুন		১১। ভোঁদড়	
১২।আকন্দ		১২।চামচিকে	
১৩।খেজুরগাছ		১৩। বনরুই	
১৪।বাবুই ঘাস		১৪। গাঙচিল	
১৫।আম		১৫। বনমোরগ	
১৬।বেতগাছ		১৬।শকুন	
১৭।পিয়ালগাছ		১৭। কাঠঠোকরা	
১৮।কাঁকড়াগাছ		১৮। বোরোলি মাছ	
১৯।কেনগাছ		১৯।ঘুঘু	
২০।অনন্তমূল		২০। ন্যাদোস মাছ	

সব কিছুর জন্য জায়গা লাগে

অরুণ , আফতাব , রাজেশ , সিধু, আর রুকসানা - সকলেরই ইচ্ছে ক্লাসে প্রথম বেঞ্চে বসবে। তাই নিয়ে সমস্যা শুরু। যদিও বা বসার জায়গা হলো, বইখাতা ব্যাগ রাখার আর জায়গা হচ্ছে না। এমন সময় দিদিমণি এসে বললেন—তোমাদের অসুবিধেটা কী শুনি?

অরুণ বলল — দিদি, আমাদের বইখাতা রাখতে পাচ্ছি না।

রুকসানা বলল — তুমি পেছনের বেঞ্চিতে চলে যাও, কাল এখানে বসবে। দিদিমণির দিকে তাকিয়ে অরুণ পরের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। ক্লাস শান্ত হলে দিদিমণি বললেন—তোমরা জায়গার কথা বলছিলে না? আচ্ছা তোমাদের একজনের স্কুলব্যাগে যা যা জিনিস আছে বার করো। এই টেবিলটাতে পাশাপাশি রাখো সেসব।

দিদিমণি বললেন — টেবিল বা টেবিলের ওপর বা আমাদের চারপাশে যা যা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি সেগুলোকে আমরা **বস্তু** বলি। বস্তু যা দিয়ে তৈরি তাকে আমরা **পদার্থ** বলি। যেমন ধরো প্লাস্টিকের বোতল বা লোহার পেরেক হলো বস্তু কিন্তু প্লাস্টিক বা লোহা হলো পদার্থ।

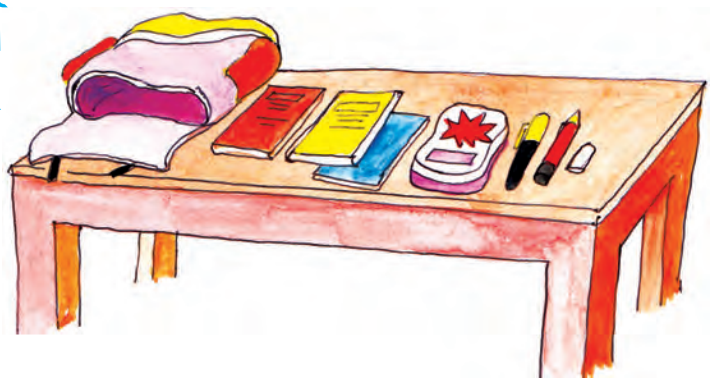

তোমার চেনা কয়েকটি বস্তুর নাম লেখো ও ছবি আঁকো। সেগুলো কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি বলে মনে হয় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

বস্তুর নাম	ছবি আঁকো	কী পদার্থ দিয়ে তৈরি বলে মনে হয়

দিদিমণি বললেন — অরুণ , বইখাতা রাখার পরে টেবিলের ওপরে কাঠের পুরো অংশটা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ?

অরুণ বলল — না দিদি ; একটু একটু দেখা যাচ্ছে। বাকিটা দেখতে পাচ্ছি না।

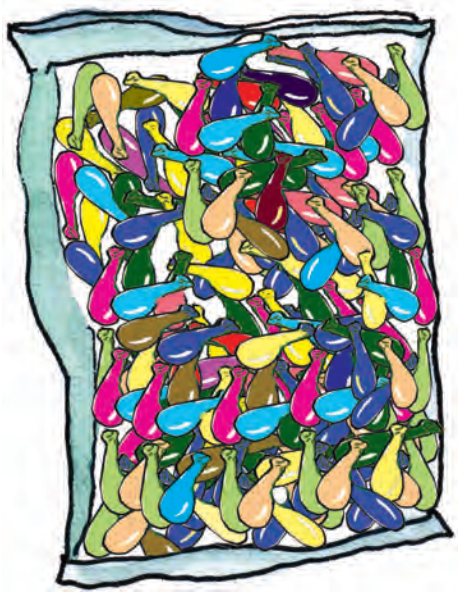

— পাচ্ছ না কেন?

অরুণ বলল --- ওই যে বইখাতাগুলো সব রাখতে জায়গা লেগেছে।

— আচ্ছা , আফতাব বলো তো তুমি যেখানে বসে আছ সেখান থেকে তোমাকে না সরিয়ে কেউ কি বসতে পারবে?

আফতাব বলল — না , দিদি , বসবে কী করে? বসতে তো জায়গা চাই।

— রুকসানা , এই জলভরতি বোতলে আর কি জল রাখা যাবে?

রুকসানা বলল — কী করে ধরবে দিদি, ওতে তো আর জায়গাই নেই!

— সিধু , তুমি কখনও ফুঁ দিয়ে বেলুন ফুলিয়েছ?

সিধু বলল — হ্যাঁ, দিদি , কতবার! বেলুন ফোলাতে আমার খুব মজা লাগে।

— বেলুনের প্যাকেটে অনেক বেলুন থাকে, না ? আচ্ছা, বেলুনের প্যাকেটে কটা ফোলানো বেলুন রাখা যাবে বলো তো?

সিধু বলল — একটাও না! ছোট্ট প্যাকেটে অত বড়ো বেলুন ধরে না কি?

—তাহলে তোমরা একটা জিনিস বুঝতে পারলে — বই খাতা রাখতে জায়গা লাগে, জল রাখতে জায়গা লাগে, এমনকী ফোলানো বেলুনও কিছুটা জায়গা নেয়।

১) নীচের ছবির মতো একটা গ্লাস বসাও। জল ঢেলে গ্লাসটা কানায় কানায় ভরতি করো। এবার গ্লাসে তোমার আঙুল ডোবাও।

কী করলে ?	কী দেখলে ?	কেন এমন হলো ?

২) একটা থালায় এক মুঠো শুকনো বালি নাও। পাশের ছবির মতো একটা গ্লাস বসাও। জল ঢেলে গ্লাসটা কানায় কানায় ভরতি করো। এবারে ওই জলভরতি গ্লাসে একটু একটু করে বালি দিতে থাকো।

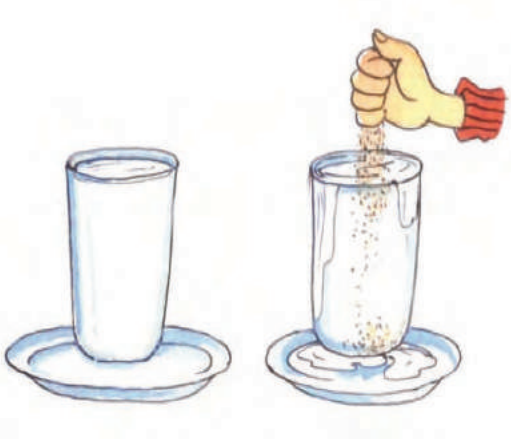

কী দেখতে পাবে	কেন এমন হলো

তাহলে বালির এক একটা দানা খুব ছোট্ট হলেও সকলে মিলে তারা বেশ খানিকটা জায়গা নেয়।

নীচের কবিতার অংশটুকু পড়ে তোমার কী মনে হয় বলত?

‘ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা,
বিন্দু বিন্দু জল —
গড়ি তোলে মহাদেশ,
সাগর অতল।’

কেউ বা কঠিন, কেউবা তরল, কেউবা গ্যাস

পরের দিন দিদিমণি এসে প্রশ্ন করলেন—আফতাব, কাল মাঠের ধারে লোকটি কী বিক্রি করছিল বলোতো?

আফতাব বলল — গ্যাস বেলুন দিদি ; বড়ো লাল রঙের বেলুনটা কী ভালো, আমার খুব কিনতে ইচ্ছে করছিল ....

দিদিমণি বললেন — আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি। এখন তুমি বলোতো বেলুনের মধ্যে কী থাকে?

আফতাব বলল — একরকমের গ্যাস, তবে কী গ্যাস জানি না।

— রাজেশ, যদি বেলুন ফেটে যায় গ্যাসটা কোথায় যায়?

রাজেশ বলল — বেলুন ফাটলে গ্যাস কী আর থাকবে, সে তো ছড়িয়ে যায়। চোখে অবশ্য দেখা যায় না।

— ঠিক বলেছ গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। তোমরা আর কেউ কোনো গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার উদাহরণ দিতে পারো?

রুকসানা বলল — আমি দেখেছি ; মশা মারার জন্য ধোঁয়া দেয় সেটা ছড়িয়ে পড়ে, বুকে গেলে কাশি হয়।

রাজেশ বলল— ধূপের ধোঁয়া, উনুনের ধোঁয়াও তো ছড়িয়ে পড়ে।

অরুণ বলল— নর্দমায় ব্লিচিং পাউডার দিলে কী একটা গ্যাস বেরোয়, নাক-চোখ খুব জ্বালা করে।

--- তোমরা সকলেই ঠিক বলেছ। ধোঁয়ার মধ্যে অনেকরকম গ্যাস মিশে থাকে, খানিকটা গুঁড়ো গুঁড়ো জিনিসও থেকে যায় অনেক সময়। আমাদের সবচেয়ে

চেনা জিনিস কী বলত যা ছাড়া আমরা বাঁচব না? তাকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু সে যখন এসে গাছের পাতা দুলিয়ে দেয় তখন বুঝি সে এসেছে।

সিধু বলল— হাওয়া।

— ঠিক বলেছ। হাওয়ায় অনেক রকম গ্যাস মিশে থাকে। তাহলে তোমরা জানো যে গ্যাসকে খোলা জায়গায় ধরে রাখা যায় না, তারা ছড়িয়ে পড়ে। আচ্ছা , সিধু তোমার বোতলের জলটা যদি একটা মগে ঢেলে দিই ....

সিধু বলল — আমাদের তিনরকম দেখতে তিনটি মগ আছে। তার কোনটায় দেবেন ?

দিদিমণি বললেন — সেটার কথা হচ্ছে না। বলছি কোনো একটা মগে যদি ঢেলে দিই তাহলে কী জলটা বোতলের মতো দেখাবে?

সিধু বলল — তা হয় না কি? বোতলের জল বোতলের মতো, মগের জল মগের মতো।

— তার মানে তুমি বলছ এক এক রকমের পাত্রে জলকে এক এক রকম আকারের দেখাবে?

সিধু বলল— হ্যাঁ, তাই।

— জলের বদলে দুধ, সরষের তেল, ডিজেল, পেট্রোল বা কেরোসিন নিলেও কি তাদের পাত্রের মতোই দেখাবে ?

অরুণ বলল— হ্যাঁ, তা তো হবেই, ওরা যে গড়িয়ে যেতে পারে।

— খুব দরকারি কথা 'গড়িয়ে যেতে পারে'।

রাজেশ বলল– ইট রেখে দিলে যেমন দেখতে ছিল তেমনি থাকে, জলের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

— ঠিক বলেছ ইট, কাঠ, লোহা, বালি, মাটি, প্লাস্টিক, কাচ এদের সব নিজস্ব নিজস্ব আকার আছে। এদের আমরা বলি কঠিন।

তাহলে বোঝা গেল যে কঠিন , তরল, গ্যাস — এদের মধ্যে কঠিনের নিজস্ব আকার আছে; তরল আর গ্যাসের নিজস্ব কোনো আকার নেই।

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লেখো।

তিনটি কঠিন পদার্থের উদাহরণ	তিনটি তরল পদার্থের উদাহরণ

কে বেশি ছড়িয়ে পড়তে চায় আলোচনা করে লেখো।

তরল না গ্যাস	
কঠিন না তরল	

কোনো কিছু ভারী, কোনো কিছু হালকা কেন?

দিদিমণি এসে বললেন— আফতাব তুমি স্কুলের বইভরতি ব্যাগ, পেনসিল বাক্স আর জলের বোতলের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আর সবচেয়ে ভারী জিনিস খুঁজে বার করো তো।

আফতাব বলল— দিদি, সবচেয়ে ভারী হলো স্কুলের বইভরতি ব্যাগ, আর সবচেয়ে হালকা হলো পেনসিল বাক্সটা।

— হাতে ধরে তুমি মোটামুটি ধারণা করেছ যে কিছু জিনিস বেশি ভারী আর কিছু জিনিস কম ভারী। কিন্তু আরো ভালো করে বুঝতে চাইলে তুমি কী করবে?

রুকসানা বলল— দাঁড়িপাল্লা আর বাটখারা দিয়ে মেপে দেখব।

— ঠিকই বলেছ। যদি তুমি দেখো দাঁড়িপাল্লার একদিকে যে কোন একটা বাটখারা চাপিয়ে অন্যদিকে জলভরতি বোতলটা রাখলে পাল্লাদুটো যদি কোনোদিকে হেলে না থাকে তাহলে বুঝবে দুটোই সমান ভারী। যে জিনিস যত ভারী তার ভর তত বেশি। বাটখারা দিয়ে কোনো জিনিসের ভর মাপা হয়।

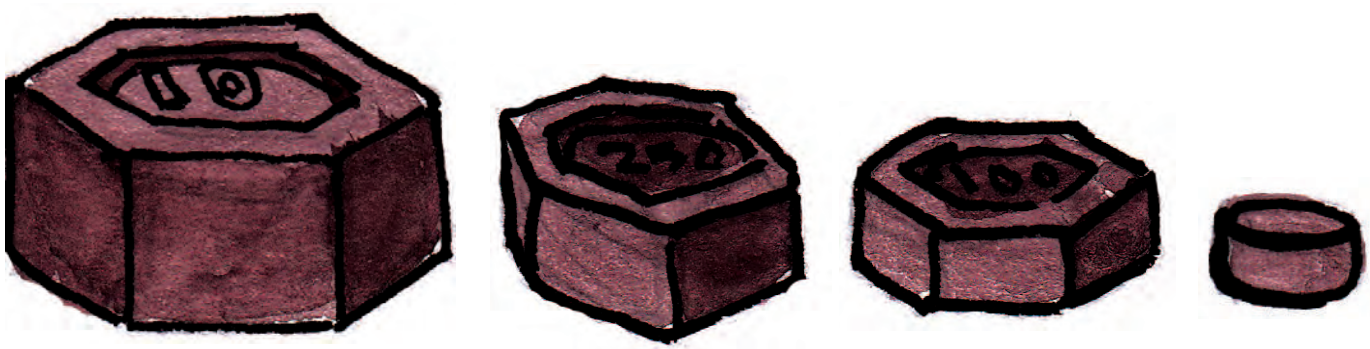

সিধু বলল— দিদি জলভরতি বোতল খালি বোতলের চেয়ে ভারী। তার মানে কি জলেরও ভর আছে?

— হ্যাঁ, শুধু জল কেন, যে-কোনো কঠিন বা , যে-কোনো তরলের একটা ভর আছে।

এসো দাঁড়িপাল্লা তৈরি করি : একটা একহাত লম্বা লাঠি নাও। লাঠির ঠিক মাঝখানে একটা ফুটো করে তাতে দড়ি বাঁধো। দুটো সমান মাপের, সমান ওজনের ঢাকনা, বা ছোটো প্লাস্টিকের থালা নিয়ে সমান মাপের দড়ি দিয়ে

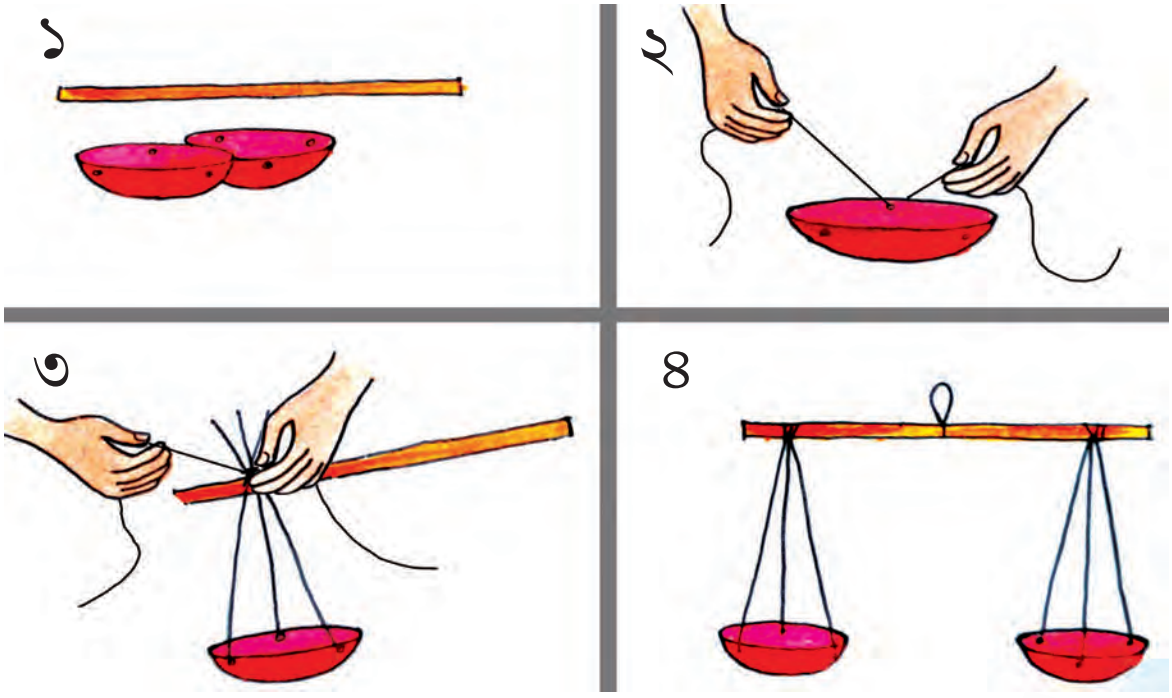

ছবির মতো করে ঝুলিয়ে দাও। মাঝের দড়িটা ধরে দেখো দু-দিক সমান থাকছে কিনা।

এক মগ শুকনো বালি আর একটা চামচ জোগাড় করো। এবার তোমার দাঁড়িপাল্লার একদিকে একটা পেন চাপাও। চামচে করে বালি নিয়ে অন্য দিকের পাল্লায় দিতে থাকো। তোমার তো বাটখারা নেই, তার কাজটা করবে বালি। যতটুকু বালি দেবার পর পাল্লা দুটো সমান সমান হবে ততটুকু বালির ভর হলো ওই পেনটার ভরের সমান। একইভাবে লুডোর ছক্কা, একটা তালা, একটা পাঁচ টাকার কয়েন এসবের ভরও মেপে দেখো।

রাজেশ বলল — দিদি , গ্যাসেরও কী ভর আছে? আমার তো তা মনে হয় না?

— হ্যাঁ, গ্যাসেরও ভর আছে। তোমার হাতে-ধরা বেলুনে যতটা গ্যাস ধরে , বা গাল ফোলালে যতটুকু গ্যাস মুখের মধ্যে থাকে তাদের ভর খুবই কম। তাই তুমি বুঝতে পারছ

না। কিন্তু তুমি কি গ্যাসের উনুনে রান্না হতে দেখেছ? গ্যাস সিলিন্ডার থেকে পাইপে করে উনুনে গ্যাস যায়, আগুন জ্বালালে পোড়ে। রান্না হতে থাকলে সিলিন্ডার ক্রমশ হালকা হতে থাকে। দেখোনি, বাড়িতে যিনি গ্যাস সিলিন্ডার দেন তাঁর ওটা আনতে কত কষ্ট হয়? কিন্তু নিয়ে যাবার সময় তিনি কত সহজেই সিলিন্ডারটা নিয়ে যান। তার মানে কী?

অরুণ বলল— রোজ রোজ গ্যাস পুড়ে যাচ্ছে বলে সিলিন্ডারের ভর কমছে।

— হ্যাঁ, তাহলে বোঝা গেল যে গ্যাসেরও ভর আছে। আচ্ছা একটা ছোটো বালির দানা, তারও কি কিছু ভর আছে? নিশ্চয়ই আছে, নইলে এক বস্তা বালি অত ভারী হয় কেন? বস্তায় অনেক বালির দানা থাকে। তাহলে বোঝা গেল কঠিন, তরল, গ্যাস সবারই ভর আছে আর প্রত্যেকেই কিছুটা জায়গা নেয়।

যার কিছুটা ভর আছে, যে কিছুটা জায়গা নেয় তাকে আমরা পদার্থ (ম্যাটার, matter) বলি। কঠিন, তরল আর গ্যাস হলো পদার্থের তিনটি অবস্থা।

বরফ গলে জল হলো, জল বাষ্প হলো

আফতাবের বাবার মাছের ব্যাবসা। আফতাব দেখেছে বরফের মধ্যে করে মাছ আসে। বাবা বলেছেন বরফে রাখলে মাছ সহজে নষ্ট হয় না। সিধুর আবার বরফের গুঁড়ো নিয়ে ডেলা তৈরি করে লোফালুফি করতে ভালো লাগে। দুজনেরই একটা সমস্যা — বরফ তাড়াতাড়ি গলে জল হতে থাকে। ক্লাসে গিয়ে দুজনেই অবাক : দিদিমণি একটা কাচের গ্লাসে করে বরফ এনে টেবিলে রাখলেন।

অরুণ বলল— দিদি, বরফ এনেছেন কেন? বরফ দিয়ে কী হবে?

— বরফ এনেছি তোমাদের দেখাব বলে। আচ্ছা দেখো তো বরফের ওপরটায় কিছু দেখতে পাচ্ছ?

রুকসানা বলল— হ্যাঁ দিদি, বরফ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

আফতাব বলল— আমিও দেখেছি, কিন্তু ওতে ধোঁয়ার গন্ধ নেই। ওটা ধোঁয়া নয়।

— ঠিক বলেছ আফতাব, ওটা ধোঁয়া নয়। ওটা কি আমি তোমাদের বলব? কিন্তু সিধু, তুমি বলতো গ্লাসের গায়ে আর কিছু দেখতে পাচ্ছ কিনা?

সিধু বলল — হ্যাঁ, হ্যাঁ, গ্লাসের বাইরে ফোঁটা ফোঁটা জল জমেছে। জল কোত্থেকে এল?

— হাওয়া একটা গ্যাসীয় মিশ্রণ, ওতে অনেক গ্যাস আছে। তা ছাড়াও হাওয়ায় জলীয় বাষ্প থাকে। খুব ঠান্ডা হলে সেই জলীয় বাষ্প থেকে জলের ফোঁটা তৈরি হয়। গ্লাসের বাইরের জলের ফোঁটাগুলো সেইভাবেই তৈরি হয়েছে।

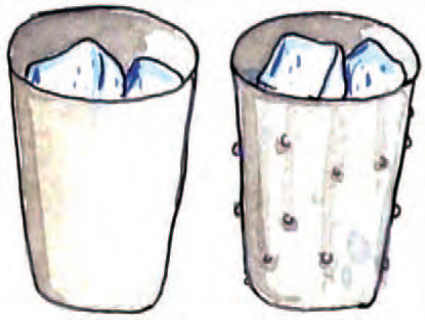

রাজেশ বলল— কিন্তু ওই ধোঁয়ার মতো জিনিসটা কী?

— হাওয়ায় থাকা ওই জলীয় বাষ্পই ঠান্ডা বরফের সংস্পর্শে খুব ছোটো ছোটো জলকণা তৈরি করেছে। যখন জলকণাগুলো হাওয়ায় ভাসছে তখন তাদের গায়ে লেগে আলো ঠিকরোচ্ছে। ওই ছোটো ছোটো জলকণাগুলো যেহেতু দল বেঁধে রয়েছে, তাই ওটা সাদা ধোঁয়ার মতো দেখাচ্ছে।

রুকসানা বলল— তাহলে গ্লাস থেকে আরেকটু উঁচুতে সাদা দেখাচ্ছে না কেন?

— খুব ছোটো ছোটো জলকণারা তাড়াতাড়ি উবে গিয়ে হাওয়ায় মিশে যায়। তখন আর তাদের দেখা যায় না। আচ্ছা, যদি এই গ্লাসসুদ্ধ বরফটা একঘণ্টা এখানে রেখে দিই, গ্লাসের মধ্যে কি তখনও বরফই পড়ে থাকবে?

সিধু বলল— না, না, সব বরফ গলে জল হয়ে যাবে।

— তাহলে আমরা তখন যে জলটা পাব তাকে যদি উনুনে ফোটাই, কী হবে?

অরুণ বলল— সাদা ধোঁয়ার মতো ভাপ বেরোবে আর জলটা উবে যাবে। ভাপ বলে কেন দিদি?

— ঠিক , এখানে জল ফুটে জলীয় বাষ্প তৈরি হবে। 'বাষ্প' কথাটা থেকেই 'ভাপ' কথাটা এসেছে। তাহলে তোমরা দেখলে জলের তিনরকম অবস্থা হয় — জল যখন কঠিন তখন তাকে আমরা বলি বরফ। বরফ গলে হয় তরল জল। আবার তরল জল ফোটালে পাওয়া যায় জলীয় বাষ্প। বরফ থেকে জল, বা জল থেকে বাষ্প, বা বাষ্প থেকে জল এসব হলো জলের অবস্থার পরিবর্তন।

নীচের প্রশ্নগুলো নিয়ে তোমরা আলোচনা করো, প্রয়োজনে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্য নাও :

(১) রোদ্দুরে যখন ভিজে গামছা রাখা হয়, গামছা শুকিয়ে যায়। জলটা কোথায় যায়?

(২) শীতকালে ঘাসে যে শিশির জমে তা আসে কোথা থেকে?

(৩) জল ছাড়া আর কী কী জিনিস ঠান্ডা করলে জমে যেতে দেখেছ?

(৪) শীতকালে নারকেল তেলের শিশিতে তেল জমে কঠিন হয়ে গেছে। কী করে শিশির মধ্যে কিছু না ঢুকিয়ে তুমি তেল বার করে মাথায় মাখবে?

(৫) সুতির জামা ইস্ত্রি করার সময় কাপড়ে একটু জল ছিটিয়ে রাখা হয়। এবার এই অল্প ভিজে কাপড়ে গরম ইস্ত্রি ঘষলে কী হতে দেখবে?

প্রকৃতিতে জলের অবস্থার পরিবর্তন:

সূর্যের তাপে সমুদ্র-নদী-পুকুর থেকে জল বাষ্প হয়। বাতাসে জলীয় বাষ্প মিশে মাটি থেকে উঁচুতে ওঠে এবং ঠান্ডা হয়। ঠান্ডা হতে হতে একসময় ছোটো ছোটো জলের ফোঁটা সৃষ্টি হয়। এই জলের ফোঁটা দিয়েই মেঘ তৈরি হয়। কখনো কখনো সেই জল আরো ঠান্ডা হয়ে বরফের টুকরোও তৈরি করে। কালবৈশাখী ঝড়ের সময়

এই বরফের টুকরোগুলো যখন এসে পড়ে আমরা বলি ‘শিল পড়ছে’। ‘শিলা’ মানে পাথর। যদিও ওগুলো পাথর নয়, তবুও কঠিন তো বটেই। ওই শিলা থেকেই শিল কথাটা এসেছে।

কত কী মিশে আছে

রোজকার জীবনে আমরা অনেক সময়েই নানারকম জিনিস মিশে থাকতে দেখি। যেমন ধরো চাল আর কাঁকর মিশে থাকে, জলে নুন বা চিনি গুললে তারা মিশে যায়। তোমরা দেখেছ মুড়িতে মুড়ির গুঁড়ো মিশে থাকে; বালি, সিমেন্ট আর জল দিয়ে সিমেন্ট মাখা হয়। একের বেশি রকমের জিনিস মিশে গেলে আমরা বলি মিশ্রণ তৈরি হয়েছে। অনেকসময় আবার মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলো আলাদা করার দরকার হয়। কী করে মিশ্রণের উপাদানগুলো আলাদা করে তা জানা যাক।

(১) হাতে করে আলাদা করা

দিদিমণি বললেন— তোমরা চাল থেকে কাঁকর আলাদা করতে দেখেছ?

রেশমা বলল— হ্যাঁ দিদি, কুলোয় নিয়ে ঝেড়ে চাল থেকে কাঁকরগুলো বেছে ফেলে দিলেই হলো।

— ঠিক বলেছ। এভাবে আলাদা করা কখন সম্ভব জানো? যদি প্রত্যেকটা জিনিস খালি চোখে দেখা আর হাতে করে ধরা যায়।

(২) হাওয়ার সাহায্যে আলাদা করা:

— তোমরা কেউ চাল থেকে ধানের খোসা আলাদা করতে দেখেছ? ধানের খোসাকে বলে 'তুষ', জানো তো?

অরুণ বলল— আমি দেখেছি দিদি। মাঠে নিয়ে গিয়ে যেখানে হাওয়া দিচ্ছে সেখানে দাঁড়াতে হবে। তারপর তুষসুদ্ধ ধান হাওয়ায় ভাসিয়ে দিতে থাকলে তা আলাদা হয়ে যাবে।

— হ্যাঁ, ধানের চেয়ে তুষ হালকা, তাই হাওয়ায় তুষটা ভেসে গিয়ে একটু দূরে পড়ে।

(৩) ছাঁকনি নিয়ে কাজ :

দিদিমণি এবার একটা ছাঁকনি তুলে দেখালেন। বললেন—এটা দিয়ে কী করা যায় বলোতো?”

সিধু বলল— চা ছাঁকা যায়। ছাঁকনির ফুটো দিয়ে চা বেরিয়ে যায়, পাতাগুলো ওপরে আটকে যায়।

— আচ্ছা যদি মুড়ি থেকে মুড়ির গুঁড়ো আলাদা করতে চাই তাহলে কী করতে হবে? এই চা ছাঁকনি দিয়ে হবে?

আফতাব বলল— ছাঁকনির ফুটোগুলো বড্ড ছোটো, মুড়ির গুঁড়োগুলো আটকে যাবে।

রুকসানা বলল— একটা চালুনি আনলেই হয়ে যাবে। চালুনিতে রেখে ঝাড়লেই গুঁড়োগুলো চালুনির ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

— তাহলে আমরা বুঝলাম যে ছাঁকনি আর চালুনির কাজ একই। দুটো ক্ষেত্রেই একই নীতিতে আলাদা করার কাজটা করা হচ্ছে।

নিজেরা আলোচনা করো :

এক গ্লাস জলে এক চামচ নুন গুলে নেওয়া হলো। এই নুন জল থেকে ছাঁকনি দিয়ে কি জল আর নুনকে আলাদা করা যাবে?

(৪) থিতিয়ে ফেলে আলাদা করা :

দিদিমণি রাজেশকে বললেন "তোমার মা কী করে চাল ধুয়ে নেন দেখেছ?"

রাজেশ বলল—চালটা নিয়ে একটু জল দিয়ে হাতে করে নাড়িয়ে নেয়, তারপর ওপরের জলটা ঢেলে ফেলে দেয়।

– হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। এতে হালকা ধুলো জলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। চালের দানা ভারী বলে তলায় থিতিয়ে পড়ে।

নদীর জলে ভাসমান সূক্ষ্ম বালিমাটি থিতিয়ে পড়ে নদী ক্রমশ বুজে আসে।

বন্যার পরে যে পলিমাটি থিতিয়ে পড়ে, সেই পলিমাটি চাষের পক্ষে খুব উপযোগী।

(৫) মিশ্রণ থেকে বাষ্প করে তরলকে সরিয়ে ফেলা :

দিদিমণি এসে অরুণকে ডেকে বললেন— তুমি এই বাটিতে একটু জল ঢালো। এতে দু-চামচ নুনকে চামচের সাহায্যে গুলে দাও। এটা কী তৈরি হলো?

অরুণ বলল— নুনজল তৈরি হলো দিদি।

— এই নুনজলটা যদি একটা থালায় ফেলে দুপুরের রোদে রেখে দিই, দু-দিন পরে কী দেখতে পাব?

রাজেশ বলল— আমি বলব দিদি? জলটা উবে যাবে, নুনটা পড়ে থাকবে।

— তুমি কী করে জানলে?

রাজেশ বলল — আমরা দিঘায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে সমুদ্রের জলে ভেজা কালো প্যান্ট না কেচে রোদে রেখেছিলাম। প্যান্টটা শুকোনোর পরে তাতে সাদা সাদা কেমন দাগ হয়ে গিয়েছিল। মা বলেছে ওটা সমুদ্রের জলের নুন।

— কী করে বুঝলে ওটা নুনই, বালি নয়?

রাজেশ বলল— ওটা যে জলে গুলে যায়, বালি তো জলে গোলে না।

আফতাব বলল— দিদি, তাহলে সমুদ্রের জল থেকে কি নুন তৈরি করা যাবে?

— হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সমুদ্রের জল থেকে এইভাবে নুন তৈরি করা কত সোজা। একসময় ভারতে এভাবে নুন তৈরি করত লোকেরা। পরে বৃটিশ শাসকরা নুন তৈরি করতে বাধা দিয়েছিল। তারা নুনের ওপর চড়া কর বসিয়ে দিয়েছিল। নুন সমস্ত মানুষ ব্যবহার করেন। নুনে কর বসালে সবারই অসুবিধা হবে। তাই বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে লবণ কর না দেওয়ার ডাক দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর নেতৃত্বে সমুদ্রের জল থেকে নুন তৈরি করেছিলেন সাধারণ মানুষ।

খাবার কোথা থেকে পাই

ওপরে খাবার তৈরির উপকরণের কিছু ছবি দেওয়া আছে। এগুলো থেকে কী কী খাবার তৈরি হতে পারে, বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লেখো।

এমন কিছু যা সরাসরি খাওয়া যায়	যে যে খাবার অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে বানানো হয়

ওপরের ছবিগুলোর সাহায্যে তোমাদের প্রতিদিনের একটা খাদ্যতালিকা তৈরি করো।

সকালে কী খাও	দুপুরে কী খাও	বিকালে কী খাও	রাতে কী খাও

ছবিতে দেওয়া উপকরণগুলো থেকে তৈরি খাবার ছাড়াও তোমার এলাকায় আর অন্য কোনোরকম খাবারের কথা জানা থাকলে সেই খাবারের নাম আর উপকরণের নাম লেখো ।

খাবারের নাম	উপকরণের নাম

প্যাকেট করা নানা খাবার

এবার নীচের ছবিগুলো ভালো করে লক্ষ করো।

নানা স্বাদের তৈরি খাবার আর প্যাকেট করা তৈরি খাবারের কথা তোমরা তৃতীয় শ্রেণিতে জেনেছ। তোমার প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় এই ধরনের কোন কোন খাবার থাকে সেটা লেখো। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো, দিদিমণিকে জিজ্ঞেস করো এই খাবারগুলো প্রায়ই খেলে শরীরের কী কী অসুবিধে হতে পারে ।

তোমার জানা খাবারের নাম	কবে তৈরি	কতদিন অবধি খাওয়া যাবে

প্যাকেট করা তৈরি খাবার প্রায়ই খেলে শরীরের কী কী অসুবিধে হতে পারে ?

১. পেটের গোলমাল

২.

৩.

৪.

না-মানুষের নানা খাবার

দিদিমণি প্রশ্ন করলেন—হাতি আর মশার খাবারের চাহিদা কি একই? গোরু আর কুকুর কি একই খাবার খায় ?

সহেলি বলল—টিভিতে দেখেছি হাতি কলাগাছ ভেঙে মুড়িয়ে খাচ্ছে।

আসমা বলল—গোরু তো ঘাস খায়। খড়, বিচালিও খায়।

যিশু বলল—প্রজাপতি ফুলের রস খায়।

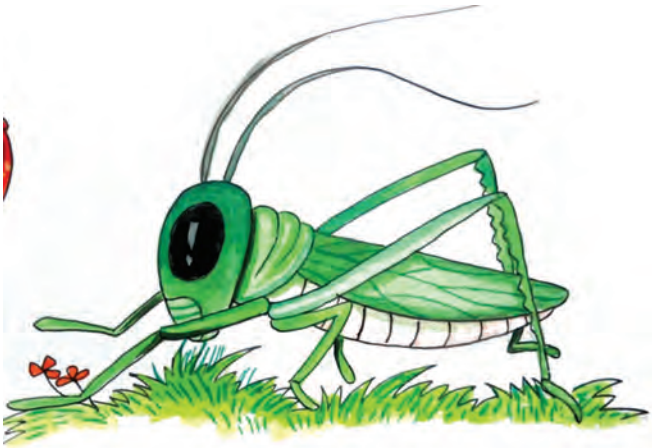

দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, সব প্রাণীদের খাওয়ার ধরন কি একইরকম ?

অরুণ বলল—কুকুর তো দাঁত দিয়ে কামড়ে খায়।

সহেলি বলল—আমাদের বাড়িতে পোষা টিয়া আছে। টিয়াকে দেখেছি ঠোঁট দিয়ে ফল ঠুকরে খায়। মুখে কিন্তু দাঁত নেই দিদি।

সব শুনে দিদিমণি বললেন—সব প্রাণীদের আবার দাঁত থাকে না। তাই সব প্রাণীদের খাওয়ার ধরনও একরকম নয়। বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন ধরনের খাবার খায়।

যিশু-সহেলিরা স্কুলে দিদিমণির সঙ্গে বিভিন্ন প্রাণীদের খাবার নিয়ে আলোচনা করল।

তোমরাও তোমাদের চারপাশের বিভিন্ন প্রাণীরা কী খায়, আর কেমনভাবেই বা খায় সেই বিষয়ে নীচে লেখো। এই বিষয়ে তোমার জানা অন্য প্রাণীদের কথাও নীচে লেখো।

প্রাণীর নাম	কী খায়	কীভাবে খায়
১. মৌমাছি	১. ফুলের রস	১. চুষে খায়
২. ঘাসফড়িং	২.	২.
৩. কেঁচো	৩.	৩.
৪. উকুন	৪.	৪.
৫. ব্যাং	৫.	৫.
৬. সাপ	৬.	৬.
৭. পায়রা	৭.	৭.
৮. বিড়াল	৮.	৮.
৯.	৯.	৯.
১০.	১০.	১০.

দাঁতের যত্ন

আসমা বন্ধুদের বলল- মা-র কয়েকদিন ধরে দাঁতে খুব ব্যথা। মা-র সঙ্গে কালকে দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেছিলাম। মা-র দাঁত নাকি খারাপ হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু মাকে দাঁতে একটা ওষুধ লাগাতে দিলেন। আর ওষুধও খেতে দিলেন। আর দাঁত ভালো রাখতে দিনে দু-বার দাঁত মাজতে বললেন।

যিশু শুনে বলল—আমি তো দিনে দু-বার দাঁত মাজি না। আমারও দাঁত খারাপ হয়ে যাবে নাকি?

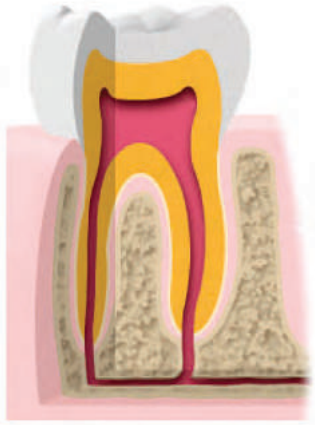

সুস্থ দাঁতের ভেতরটা কেমন

আসমা বলল—দু-বার করেই দাঁত মাজবি এখন থেকে। আমিও তাই করব।

সহেলি বলল—আজ স্কুলে গিয়ে দিদিমণিকে দাঁতের কথা জিজ্ঞেস করব।

ক্লাসে সহেলি দিদিমণিকে জিজ্ঞেস করল—দিদি, আসমা বলছিল দিনে দু-বার দাঁত না মাজলে দাঁত নাকি খারাপ হয়ে যায়?

খারাপ হয়ে যাওয়া দাঁতের ভেতরটা কেমন

দিদিমণি বললেন—শুধু দিনে দু-বার দাঁত মাজলেই হবে না। কোনো কিছু খাওয়ার পরেও ভালো করে মুখ ধুয়ে নিও। না হলে দাঁত খারাপ হয়ে যেতে পারে। তখন আবার দাঁত তুলে ফেলতে হতে পারে। আসমা, তুমি এত কিছু জানলে কী করে?

আসমা বলল—মায়ের সঙ্গে আমি দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেছিলাম। ওখানে আমি গোটা দাঁতের ছবিতে

দেখেছি। কত বড়ো দাঁত! সেখানে আবার একটা খারাপ হয়ে যাওয়া দাঁতের ছবিও ছিল।

— আসলে দাঁতের বেশিরভাগ অংশটাই মাড়ির ভেতরে থাকে। খুব অল্প অংশই মাড়ির বাইরে থাকে। জানো কি, মাড়ির বাইরে থাকা দাঁতের অংশটাই হলো শরীরের সবচেয়ে কঠিন অংশ।

আসমা জিজ্ঞেস করল—দাঁত খারাপ হয় কেন দিদি?

— খাবার খাওয়ার সময় দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো আটকে যেতে পারে। আর ওই খাবারের টুকরোয় বাসা বাঁধে খালি চোখে দেখা যায় না এমন সব জীব। দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারে বাসা বাঁধা জীবেরাই দাঁতকে খারাপ করে দেয়।

দাঁতের যত্ন

১. আমাদের দাঁত মাজা দরকার কেন?

.....

২. দাঁত কখন এবং কীভাবে মাজা দরকার ?

.....

৩. দাঁতের ফাঁকে খাবার আটকে থাকলে কী কী সমস্যা হতে পারে ?

.....

তোমার বা তোমার বন্ধুদের কারোর কি কখনও দাঁতের সমস্যা হয়েছে? বন্ধু এবং শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের ফাঁকা স্থান পূরণ করো। দাঁতের অন্যরকম কোনো সমস্যার কথা জানা থাকলে সেটাও লেখো।

দাঁতের সমস্যা	কেন এমন হয়েছে	কী করা দরকার	সমস্যার সমাধান না করলে কী হতে পারে
দাঁতে ব্যথা			
মাড়ি থেকে রক্ত পড়া			
মাড়ি ফুলে যাওয়া			

দাঁত নিয়ে নানা কথা

অরুণ জিজ্ঞেস করল —খারাপ হয়ে যাওয়া দাঁত তো তুলে ফেলতে হয় দিদি। তাতেই বা ক্ষতি কী ! আমাদের মুখে তো অনেক দাঁত থাকে। তার একটা দুটো তুলে ফেললে কী ক্ষতি?

আসমা বলল— তাহলে আমরা খাবার চিবোব কী করে?

— ঠিকই বলেছ। কিন্তু চিবোনো ছাড়াও দাঁতের আরো নানারকম কাজ আছে। আর আমাদের মুখে অনেক দাঁত আছে ঠিকই। কিন্তু সব দাঁত একরকম নয়। আবার তাদের কাজও নানারকম।

তুমি আর তোমার বন্ধুরা তো নানাধরনের খাবার খাও। দেখোতো নীচে যে খাবারগুলোর নাম দেওয়া আছে সেগুলো তোমরা কীভাবে খাও? তোমার ইচ্ছামতো আরো কিছু খাবারের নাম যোগ করতে পারো।

দিদিমণি বললেন— দাঁত তাহলে কতরকমের কাজ করে?

অরুণ বলল— চাররকমের দিদি, কাটা, ছেঁড়া, ভাঙা আর গুঁড়ো করা। তাহলে দাঁতও কি চার রকমের?

— ঠিক বলেছ। আমাদের মুখে চার ধরনের দাঁতই থাকে। ছবি থেকে ওদের চিনে নাও। গুনে দেখোতো মুখে কতগুলো দাঁত আছে।

খাবারের নাম	কীভাবে খাও
১. বাদাম	১. দাঁত দিয়ে ভেঙে
২. মাংস	২. দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে
৩. চিনির দানা/মিছরি	৩. দাঁত দিয়ে গুঁড়িয়ে
৪. পাঁউরুটি	৪. দাঁত দিয়ে কেটে
৫. ভুট্টার দানা	৫.
৬. বিস্কুট	৬.
৭. পাটালি গুড়	৭.
৮. খোসাসুদ্ধ আম	৮.

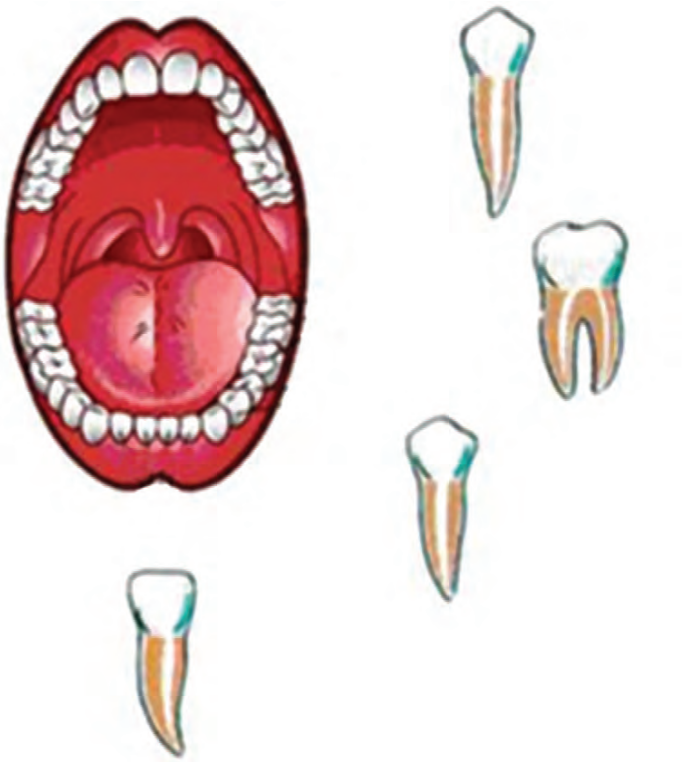

এবারে একটা কথা বলোতো, জন্মের সময় একটা বাচ্চার মুখে কি দাঁত থাকে ?

সহেলি বলল- কয়েকদিন আগে আমার কাকিমার মেয়ে হয়েছে। কই তার মুখে তো কোনো দাঁত দেখিনি।

— ঠিকই। জন্মের পরে প্রথম দিকে দাঁত থাকে না। জন্মের সাধারণত ছয় মাস পর থেকে দাঁত উঠতে আরম্ভ করে।

যিশু বলল—আমার তো আবার কিছু দাঁত পড়ে গেছে। আবার কিছু দাঁত নতুন করে উঠছে।

— আসলে প্রথম যে দাঁতগুলো ওঠে সেগুলো সারাজীবন থাকে না। এগুলোকে বলে দুধের দাঁত। সাধারণত ছয়

বছর থেকে বারো বছর বয়স অবধি এই দাঁতগুলো থাকে।
ছবি দেখে এইরকম দাঁত কতগুলো থাকে গুনে দেখত।

তোমার বাড়ির বা আশেপাশের বাড়ির সদ্য জন্মানো বা একটু বেড়ে ওঠা শিশুকে লক্ষ করো। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষক /শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

১. জন্মের সময় চোয়ালে কী দাঁত থাকে?

.....

২. জন্মানোর কত মাস বয়স পর থেকে দাঁত গজাতে শুরু করে? .....

৩. আর ওই শিশু তিন বছর বয়সে পৌঁছোলে এই দাঁতের সংখ্যা হয়- ..... (২০/৩২/৪২/৪৮)

৪. কত বছর বয়সে পৌঁছোলে দুধের দাঁত পড়ে যায়?

.....

৫. তারপর যে নতুন দাঁত গজাতে শুরু করে সেগুলো কি সারাজীবন থেকে যায়? .....

তোমার দাঁত ওঠা ও দাঁত পড়ে যাওয়া নিয়ে যে যে অভিজ্ঞতা আছে তা লিখে ফেলো।

খাবার হজম হলো

অরুণ বলল— আমি তো খুব তাড়াতাড়ি খাই। মা বলেন, আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে। তবেই নাকি খাবার হজম হবে। সত্যি দিদি?

দিদিমণি বললেন— তোমার মা ঠিকই বলেন। দাঁত দিয়ে আমরা খাবারকে কী করি বলোতো?

আসমা বলল— দাঁত দিয়ে তো আমরা খাবারকে ভেঙে টুকরো করি।

— বাঃ, ঠিক বলেছ। খাবারকে ভেঙে টুকরো করাই হলো হজমের প্রথম ধাপ। দাঁত দিয়ে খাবার চিবোনোর সময় আর কী হয় বলত?

সহেলি বলল— খাবারটা নরম হয়ে দলা পাকিয়ে যায়।

— ঠিক বলেছ। আমাদের মুখের আশেপাশে থাকে কয়েকটা লালাগ্রন্থি। লালাগ্রন্থি থেকে বেরোয় লালারস। লালারসে থাকে হজমের রস। হজম করানো ছাড়াও লালারস খাবারকে দলা পাকিয়ে দেয়। যাতে খাবার সহজেই গলা দিয়ে নেমে যায়।

অরুণ জিজ্ঞেস করল—হজম মানে কী দিদি?

— হজম মানে হলো খাবারকে খুব ছোটো ছোটো কণায় ভেঙে ফেলা। যাতে খাবারের ওই কণাগুলো শরীর খুব সহজেই নিয়ে নিতে পারে।

এর মধ্যেই স্কুলের ঘণ্টা পড়ে গেল। যিশুর খুব তাড়া। দৌড়, দৌড়। খেলার মাঠ ডাকছে। মাঠে বল নিয়ে ঈশান, অরুণ, রহমান, রবিনরা অপেক্ষা করছে। এদিকে মা খেতে দিয়েছে। তাড়াহুড়ো করে খাচ্ছে আর স্কুলে আজ কী কী হলো সেই গল্প বলছে মাকে। এইসব করতে গিয়ে যিশু হঠাৎ জোরে জোরে কাশতে আরম্ভ করল। মা যিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন—আস্তে আস্তে খেতে পারিস না। সবসময় তাড়াহুড়ো। খেতে খেতে কথা বলছিস। দেখ তো কেমন বিষম লাগল!

পরদিন ক্লাসে যিশু জিজ্ঞেস করল—আমাদের বিষম কেন লাগে দিদি?

দিদিমণি বললেন— আসলে আমাদের গলার ভেতরে পাশাপাশি দুটো নল আছে। একটা নল দিয়ে খাবার যায়।

আর একটা নল দিয়ে বাতাস যায়। খাওয়ার সময় কথা বললে কখনো-কখনো খাবারের টুকরো ভুল পথে ওই বাতাস যাওয়ার নলে ঢুকে পড়তে পারে। তখন শরীর চায় বাতাস যাওয়ার নলটা থেকে ওই খাবারের টুকরোটাকে বার করে দিতে। না হলেই বিপদ।

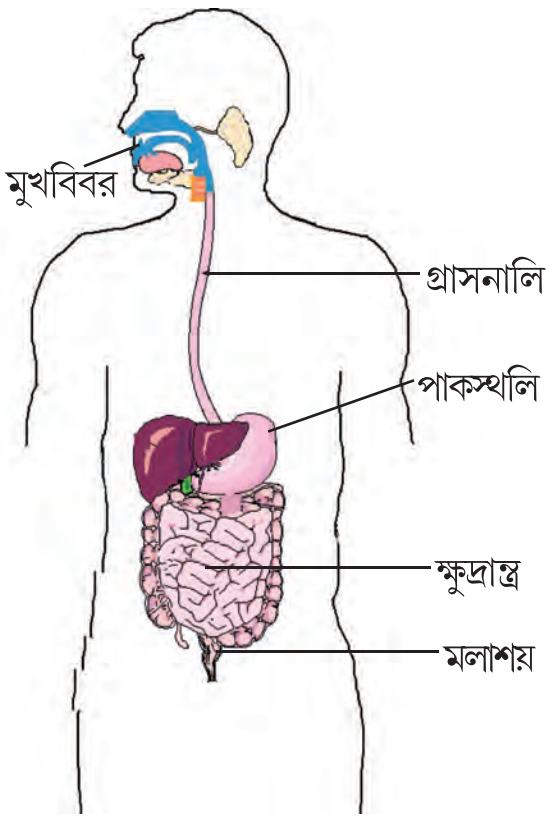

মঞ্জু জিজ্ঞেস করল - কী বিপদ দিদি?

— বাতাস যাওয়ার নলে খাবারের টুকরো ঢুকে গেলে বাতাস তো আর যেতে পারবে না। তখন আমাদের দম আটকে আসবে। কিন্তু আর একটা নল দিয়ে কী যায় বলত?

রবিন বলে উঠল, দিদি খাবার যায় কি?

— বাঃ, ঠিক বলছ। ওই নল দিয়ে খাবার নীচের দিকে নেমে যায়।

রহমান জিজ্ঞেস করল—নীচে নেমে খাবার কোথায় যায় দিদি?

— ওই নলের শেষে একটা থলির মতো অংশ আছে। তার নাম **পাকস্থলি**। খাবার এরপর পাকস্থলিতে চলে আসে। এখানে খাবারের কিছুটা অংশ হজম হয়।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করল—তারপর খাবার কোথায় যায় দিদি?

— এরপর আরো নীচে নেমে খাবার পৌঁছোয় বড়ো প্যাঁচালো নলের মতো একটা অংশে। এর নাম **অন্ত্র**। অন্ত্রের একটা অংশে খাবারের বাকিটা হজম হয়। এটা **ক্ষুদ্রান্ত্র**। খাবারের যে অংশটা হজম হয় না তা মল হিসাবে **মলাশয়ে** কিছুক্ষণ জমা থাকে। তারপর শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়।

খাবারের দলা নল দিয়ে নীচে নেমে আসে। পাকস্থলিতে পৌঁছোয়। তারপর হজমের রসের সঙ্গে মিশে খাবার আরও ছোটো কণায় পরিণত হয়।

পাকস্থলি থেকে খাবারের কণা অন্ত্রে আসে। এখানে নানারকম হজমের রসের সাহায্যে খাবারের কণাগুলো আরো ছোটো হয়। খাবারের কণাগুলো ছোটো হতে হতে শরীরে মিশে যাবার মতন হয়।

নীচের দুটো ছবি ভালো করে দেখো। তারপর দলে আলোচনা করো। বাঁদিকে খাবারের ছোটো ছোটো টুকরোতে ভেঙে যাওয়ার ছবি দেওয়া হয়েছে। ডানদিকে মানুষের শরীরের ছবি দেওয়া হয়েছে। মানুষের শরীরের যে যে অংশে ওই কাজগুলো হয় তার সঙ্গে মেলাও। ফাঁকা বাক্সতে ওই অংশগুলোর নাম লেখো।

দাঁত দিয়ে খাবার ভাঙা ও চিবোনো হয়

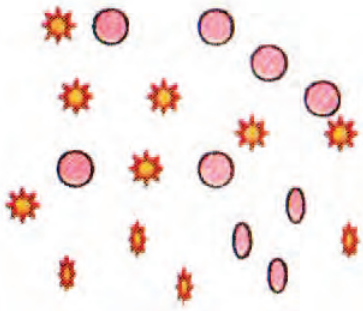

পেটের মধ্যে খাবার আরো ছোটো হয়ে যায়

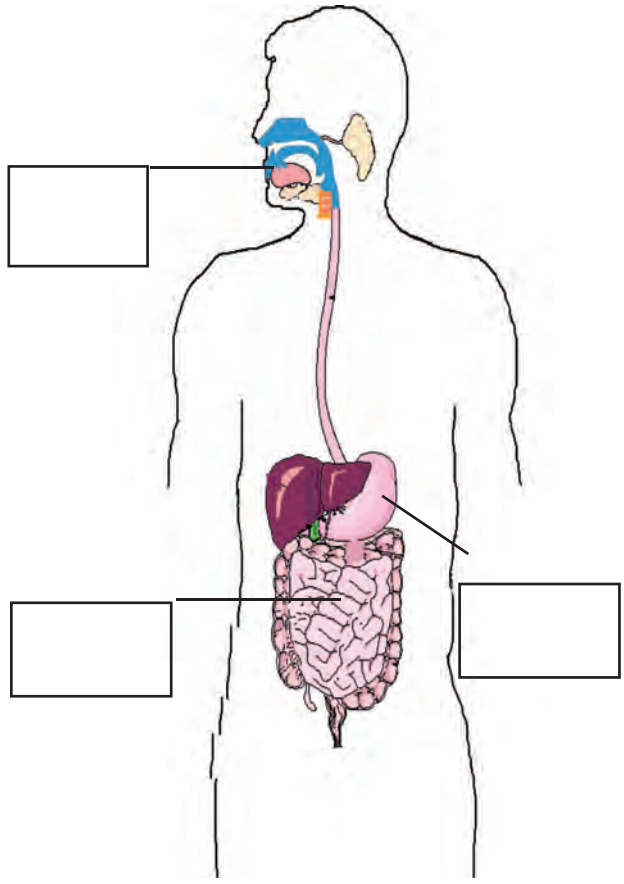

যদি তোমার খাবার ঠিকমতো হজম না হয় বা দীর্ঘসময় ধরে মল দেহ থেকে না বেরোয় তবে কী কী সমস্যা হতে পারে?

অসুখ থেকে বাঁচতে খাবার

আনিসুরচাচা অনেকদিন পর পালানদের বাড়িতে এলেন। পালানের বাবা জিজ্ঞেস করলেন - কী ব্যাপার আনিসুর, এতদিন আসনি কেন?

আনিসুর বললেন—খুব জ্বরে ভুগলাম কদিন। তারপর থেকে খাবারে অরুচি। বেশ দুর্বল লাগছে। পালানের বাবা বললেন তোমাকে তো বারবার বলতাম ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করতে। এত পরিশ্রম করলে কি আর শরীর থাকবে! সময়মতো খাবার খেলে শরীরটা এত দুর্বল হতো না। ডাক্তার কী বলেছেন?

— ডাক্তারবাবু বলেছেন, দীর্ঘদিন সময়মতো খাওয়াদাওয়া না করায় শরীর খারাপ হয়েছে। সময়মতো ঠিকঠাক আর পরিমাণমতো খাবার খেলে শরীর ভালো হয়ে যাবে।

পালান ভাবল, ঠিকঠাক খাবার মানে কী? স্কুলে গিয়ে দিদিমণিকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

পরদিন ক্লাসে এসব নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। পালানের কথা শুনে দিদিমণি বললেন---হাতি আর মশার কি খাবারের চাহিদা একই? গোরু আর বাছুর কি একই খাবার খায়? শরীর-এর চাহিদা অনুযায়ী খাবার খেতে হয়। তবে এমন খাবারই খেতে হবে যা শরীরকে সুস্থ রাখবে। যে খাবার খেলে আমাদের শরীরের আকার ও ওজন বাড়বে। তবে সময়মতো খাবার খাওয়াও দরকার।

পিয়ালী বলল- দিদি, মা বলছিলেন ঠিকমতো খাবার না খেলে নাকি রাতে চোখে দেখতে অসুবিধা হয়?

দিদিমণি বললেন - হ্যাঁ ঠিকই তো। শাকসবজি, গাজর, পাকা পেঁপে এসব খাওয়া চোখের পক্ষে ভালো। এছাড়াও

টক জাতীয় ফল যেমন লেবু যারা খায়, তাদের দাঁত আর মাড়ি খুব সুস্থ থাকে।

আনিসুর বলল — দিদি আমার ভাই একদম দুধ, মাছ এসব খেতে চায় না।

— সেকি কথা! ভাইকে বোঝাবে দুধ, মাছ, ডিম, ডাল, সয়াবিন এসব খেতে হয়। না হলে ও খুব রুগ্ন হয়ে যাবে।

তোমরা এবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দেখোতো খাবার ঠিকমতো না খেলে এইরকম আর কী কী সমস্যা আসতে পারে। প্রয়োজনে তোমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিতে পারো।

ঠিক মতো খাবার না খেলে যে ধরনের সমস্যা হতে পারে	কী ধরনের খাবার খেলে এই সমস্যা এড়ানো যায়

খাবার খেয়ে কী পাই ?

খেলতে, দৌড়োতে অথবা কাজ করতে তোমার কী লাগে? খাবার থেকে আমরা কী পাই যা পেলে আমরা ওপরের ছবিতে দেখানো কাজগুলো করতে পারি?

.....

ফাঁকা বাক্সে কী শব্দ বসবে ভেবে লেখোতো।

খাবার	→	শক্তি	→	

কাজ করার জন্য ..... প্রয়োজন হয়।

কাজ করার জন্য চাই খাবার

দিদিমণি বললেন— আমরা সবাই তো সারাদিন নানারকম কাজ করি। তোমরা স্কুলে আসো, খেলাধুলা করো,

পড়াশোনা করো - এসবও তো কাজ। সারাদিনে তোমরা কী কী কাজ করো তার একটা তালিকা তৈরি করার চেষ্টা করো।

তোমরা সারাদিন কী কী কাজ করো এবং কখন করো সেটা নীচে লেখো।

কী কাজ করো	কখন করো

দিদিমণি এবারে জিজ্ঞেস করলেন—যদি আমরা সারাদিন কিছু না খাই, তাহলে আমাদের গায়ের জোর কি কমে যাবে?

মঞ্জু বলল - গায়ের জোর পুরোপুরি হয়তো কমে যাবে না। কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ব।

— আমরা তো সারাদিন এতসব কাজ করি। সেই কাজ করার শক্তি পাই কোথা থেকে ?

আসলাম বলল — আমরা তো খাবার খাই। খাবার থেকেই শক্তি পাই।

দিদিমণি বললেন- ঠিক বলেছ। তবে এক এক রকম কাজের জন্য এক এক পরিমাণ শক্তি দরকার।

যে-কোনো কাজ করতে শক্তির প্রয়োজন হয়। কোনো কাজে শক্তি লাগে বেশি। আবার কোনোটায় শক্তির প্রয়োজন হয় কম। খাবার খেয়ে আমরা সেই শক্তির চাহিদা মেটাই।

নীচের প্রাণীগুলোর ছবি লক্ষ করো। ছবির নীচে লেখো কে কোন কাজের ভঙ্গিতে রয়েছে :

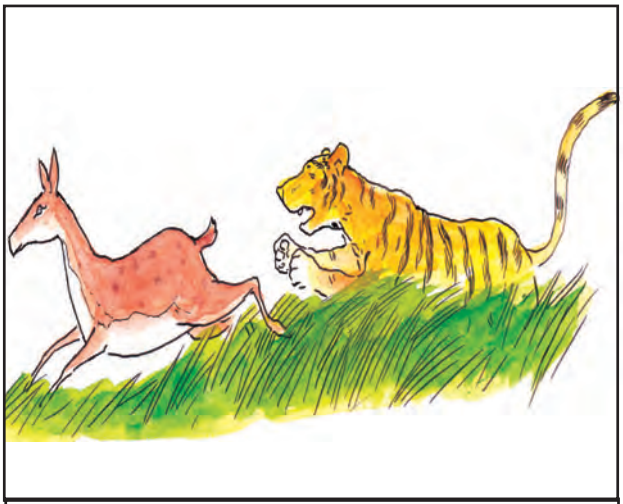

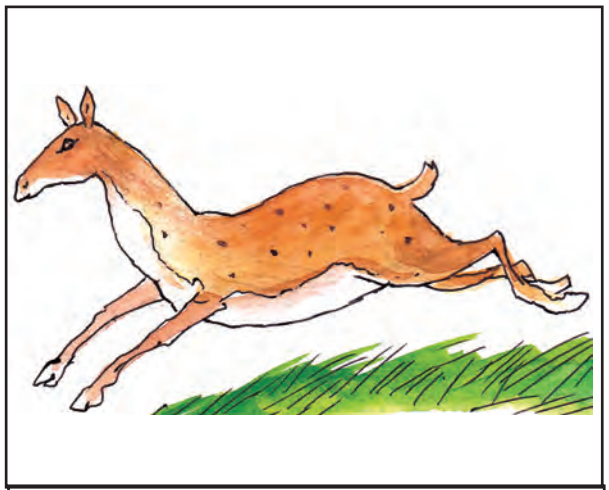

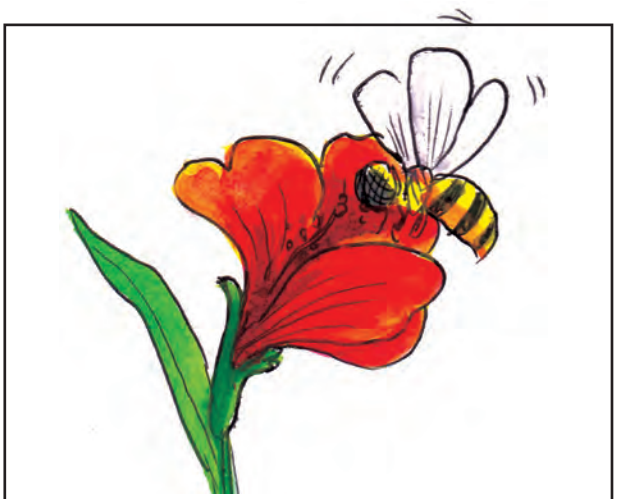

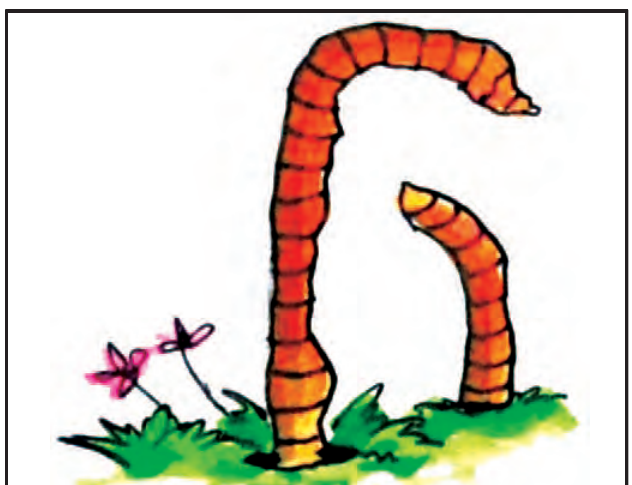

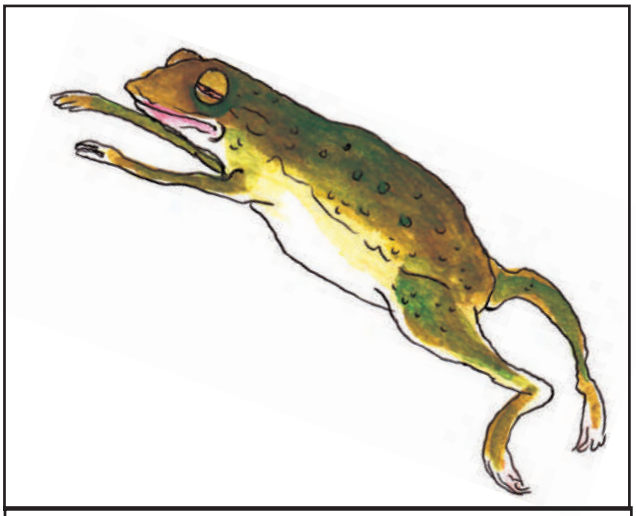

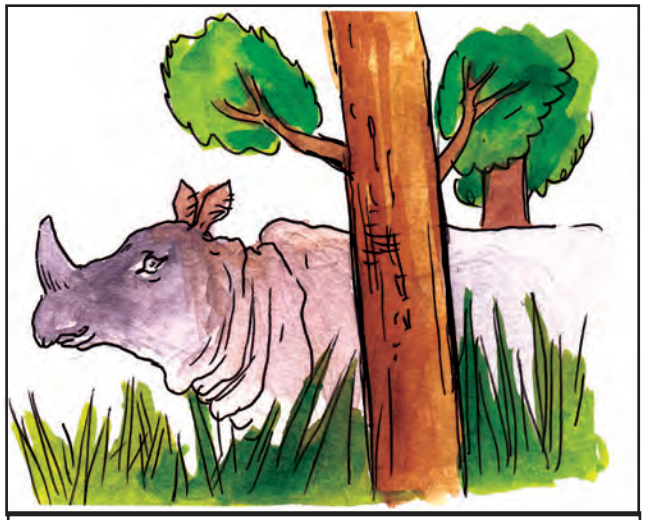

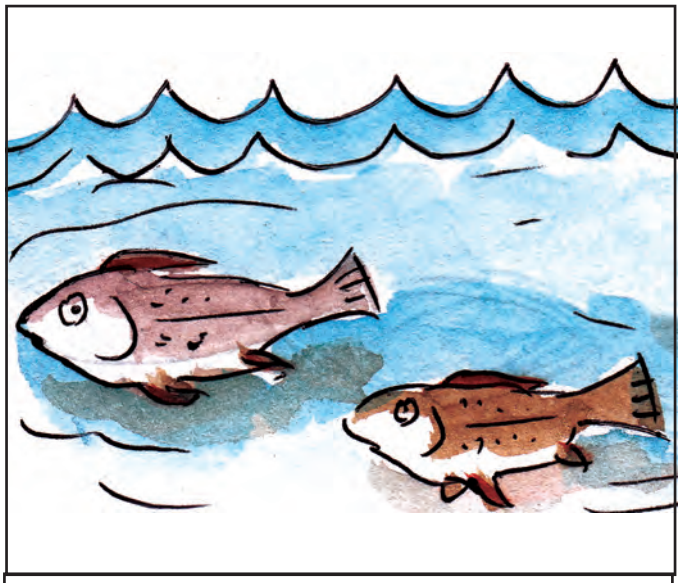

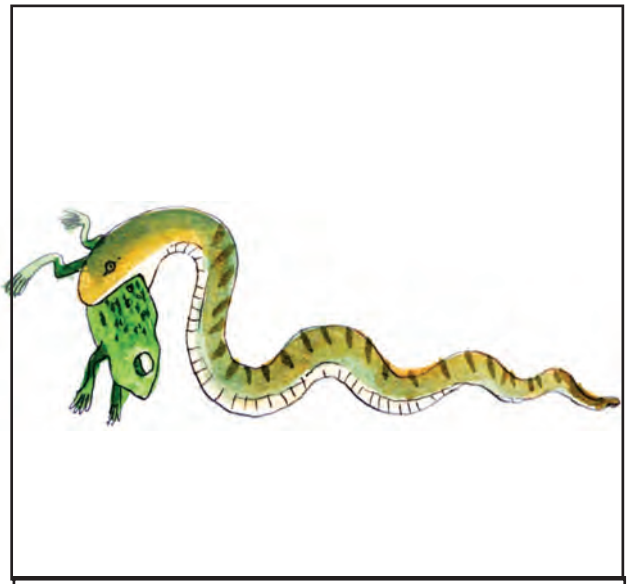

শরীর